সাহিত্যসঞ্চয়

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্-এর নূতন সিলেবাস অনুসারে অনুমোদিত
ষষ্ঠ শ্রেণীর সাহিত্য।

[Vide Notification No. TB/74/VI/TB/207 and also Board's Letter No. 10367/G, dated 24. 11. 75]

সাহিত্য সঞ্চয়

[ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য]

মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি
(এস. টি. ই. এ.)
বর্ধমান জেলা-শাখা
সম্পাদিত

একমাত্র পরিবেশক :
জাতীয় প্রকাশক
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬৪।২, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
এস. সেন
৬৪।২, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : ২রা ডিসেম্বর, ১৯৭৩
দ্বিতীয় প্রকাশ : ৭ই মার্চ, ১৯৭৪
তৃতীয় প্রকাশ : ১৬ই মার্চ, ১৯৭৬
চতুর্থ প্রকাশ : ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯
পঞ্চম প্রকাশ : ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৮১

[টাইপ—পাইকা—২২"×৩২"]

মূল্য : টা. ... পয়সা মাত্র।

: এজেন্ট :
জাতীয় পুস্তকালয় :
১১৫, বি. সি. রোড, বর্ধমান।

কালনা বুক কোং
সোনাপটী, কালনা, বর্ধমান

মুদ্রাকর :
অমলকৃষ্ণ কুমার
উমাশংকর প্রেস
১২ গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০০০৬

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ

কলিকাতার পথে

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

[**লেখক পরিচিতি :** এই প্রবন্ধটির লেখক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি মেদিনীপুর জিলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ; মাতার নাম ভগবতী দেবী। শৈশবে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া তিনি বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন। কর্মজীবনে তিনি সংস্কৃত কলেজ এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। শিক্ষা, সাহিত্য ও বাংলা ভাষার উন্নতি সাধনে তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সমাজ-সংস্কারক হিসাবে তাঁহার নাম চিরদিন ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করেন এবং বহুবিবাহ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন এবং সত্যসত্যই তিনি দয়ার সাগর বলিয়া বিখ্যাত।]

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে, আমি পুনরায় কলিকাতায় আনীত হইলাম। প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময়, একজন ভৃত্য সঙ্গে আসিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ চলিয়া, আর চলিতে না পারিলে, ঐ ভৃত্য খানিক আমায় কাঁধে করিয়া লইয়া আসিত। এবার আসিবার পূর্বে, পিতৃদেব আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, চলিয়া যাইত পারিবে, না লোক লইতে হইবেক। আমি বাহাদুরি করিয়া বলিলাম,—লোক লইতে হইবেক না, আমি অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারিব। তদনুসারে আর লোক লওয়া আবশ্যক হইল না। পিতৃদেব আমায় লইয়া

বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। মাতৃদেবীর মাতুলালয় পাতুল, বীরসিংহ হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্তী। এই ছয়ক্রোশ অবলীলাক্রমে চলিয়া আসিলাম। সেদিন পাতুলে অবস্থিতি করিলাম।

তারকেশ্বরের নিকটবর্তী রামনগর নামক গ্রাম আমার কনিষ্ঠা পিতৃস্বসা অন্নপূর্ণাদেবীর শ্বশুরালয়। ইতঃপূর্বে অন্নপূর্ণাদেবী অসুস্থ হইয়াছিলেন; এজন্য পিতৃদেব কলিকাতায় আসিবার সময়, তাঁহাকে দেখিয়া যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। তদনুসারে, আমরা পরদিন প্রাতঃকালে, রামনগর অভিমুখে প্রস্থান করিলাম। রামনগর পাতুল হইতে ছয়ক্রোশ দূরবর্তী। প্রথম দুই-তিন ক্রোশ অনায়াসে চলিয়া আসিলাম। শেষ তিন ক্রোশে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইল। তিন ক্রোশ চলিয়া, আমার পা এত টাটাইল যে আর ভূমিতে পা পাতিতে পারা যায় না। ফলকথা এই, আর আমার চলিবার ক্ষমতা কিছুমাত্র রহিল না। অনেক কষ্টে, চারি পাঁচ দণ্ডে আধক্রোশের অধিক চলিতে পারিলাম না। বেলা, দুই প্রহরের অধিক হইল, এখনও দুই ক্রোশের অধিক পথ বাকি রহিল।

আমার এই অবস্থা দেখিয়া, পিতৃদেব বিপদগ্রস্থ হইয়া পড়িলেন। আগের মাঠে ভাল তরমুজ পাওয়া যায়, শীঘ্র চলিয়া আইস, ঐখানে তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইব। এই বলিয়া তিনি লোভ প্রদর্শন করিলেন এবং অনেক কষ্টে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন, তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইলেন। তরমুজ বড় মিষ্ট লাগিল। কিন্তু পা'র টাটানি কিছুই কমিল না। বরং খানিক বসিয়া থাকাতে, দাঁড়াইবার ক্ষমতা পর্যন্ত রহিল না। ফলতঃ আর এক পা চলিতে পারি, আমার সেইরূপ ক্ষমতা রহিল না। পিতৃদেব অনেক ধমকাইলেন এবং তবে তুই এই মাঠে একলা থাক, এই বলিয়া, ভয় দেখাইবার নিমিত্ত আমায় ফেলিয়া খানিকদূর চলিয়া গেলেন। আমি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। পিতৃদেব

সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, কেন তুই লোক আনিতে দিলি না, এই বলিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়া, দুই একটা থাবড়াও দিলেন।

অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, পিতৃদেব আমায় কাঁধে করিয়া লইয়া চলিলেন। তিনি স্বভাবতঃ দুর্বল ছিলেন, অষ্টমবর্ষীয় বালককে স্কন্ধে লইয়া অধিকদূর যাওয়া তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত। সুতরাং খানিক গিয়া আমায় স্কন্ধ হইতে নামাইলেন এবং আমায় বলিলেন, বাবা, খানিক চলিয়া আইস, আমি পুনরায় কাঁধে করিব। আমি চলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই চলিতে পারিলাম না। অতঃপর আর আমি চলিতে পারিব, সে প্রত্যাশা নাই দেখিয়া, পিতৃদেব খানিক স্কন্ধে করিয়া লইতে লাগিলেন, খানিক পরেই ক্লান্ত হইয়া, আমায় নামাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুইক্রোশ পথ যাইতে প্রায় দেড় প্রহর লাগিল। সায়ংকালের কিঞ্চিৎ পূর্বে আমরা রামনগরে উপস্থিত হইলাম, এবং তথায় সে রাত্রি বিশ্রাম করিয়া, পরদিন শ্রীরামপুরে থাকিয়া, তৎপরদিন কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম।

গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যতদূর শিক্ষা দেবার প্রণালী ছিল, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ও স্বরূপচন্দ্র দাসের নিকট আমার সে পর্যন্ত শিক্ষা হইয়াছিল। অতঃপর কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, এ বিষয়ে পিতৃদেবের আত্মীয়বর্গ, স্ব-স্ব ইচ্ছার অনুযায়ী পরামর্শ দিতে লাগিলেন। শিক্ষাবিষয়ে আমার কিরূপ ক্ষমতা আছে, এ বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল। সেই সময়ে, প্রসঙ্গক্রমে, পিতৃদেব মাইল স্টোনের উপাখ্যান বলিলেন। সেই উপাখ্যান এই—

প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময়, শিয়াখালায় সালিখার বাঁধা রাস্তায় উঠিয়া, বাটনাবাটা শিলের মত একখানা প্রস্তর রাস্তার ধারে পোঁতা দেখিতে পাইলাম। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, বাবা, রাস্তার ধারে শিলা পোঁতা আছে কেন? তিনি

আমার জিজ্ঞাসা শুনিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, ও শিল নয় উহার নাম মাইল স্টোন। আমি বলিলাম, বাবা, মাইলস্টোন কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন তিনি বলিলেন, এটি ইংরেজী কথা, মাইল শব্দের অর্থ আধ ক্রোশ ; স্টোন শব্দের অর্থ পাথর ; এই রাস্তার আধ আধ ক্রোশ অন্তরে, এক একটি পাথর পোঁতা আছে ; উহাতে এক, দুই, তিন প্রভৃতি অঙ্ক খোদাই রহিয়াছে ; এই পাথরের অঙ্ক উনিশ মাইল, অর্থাৎ সাড়ে নয় ক্রোশ। এই বলিয়া তিনি আমাকে ঐ পাথরের নিকট লইয়া গেলেন।

নামতায় "একের পিঠে নয় উনিশ" ইহা শিখিয়াছিলাম। দেখিবা-মাত্র আমি প্রথমে এক অঙ্কের তৎপরে নয় অঙ্কের উপর হাত দিয়া বলিলাম, তবে এটি ইংরেজীর এক আর এইটি ইংরেজীর নয়। অনন্তর বলিলাম, তবে বাবা, ইহার পর যে পাথরটি আছে, তাহাতে আঠার, তাহার পরটিতে সতর, এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক পর্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইব। তিনি বলিলেন, আজ দুই পর্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইবে, প্রথম মাইল স্টোন যেখানে পোঁতা আছে, আমরা সেদিক দিয়া যাইব না। যদি দেখিতে চাও, আর একদিন দেখাইয়া দিব। আমি বলিলাম, সেটি দেখিবার আর দরকার নাই ; এক অঙ্কটি এইটিতেই দেখিতে পাইয়াছি। বাবা, আজ পথে যাইতে যাইতেই, আমি ইংরেজীর অঙ্কগুলি চিনিয়া ফেলিব।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, প্রথম মাইল স্টোনের নিকটে গিয়া আমি অঙ্কগুলি দেখিতে ও চিনিতে আরম্ভ করিলাম। মনবেড় চটিতে দশম মাইল স্টোন দেখিয়া পিতৃদেবকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলাম, বাবা, আমার ইংরেজী অঙ্ক চিনা হইল। পিতৃদেব বলিলেন, কেমন চিনিয়াছ, তাহার পরীক্ষা করিতেছি। এই বলিয়া তিনি নবম, অষ্টম, সপ্তম - এই তিনটি মাইল স্টোন ক্রমে ক্রমে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, - আমি এটি নয়, এটি

আট, এটি সাত – এইরূপ বলিলাম। পিতৃদেব ভাবিলেন, আমি যথার্থই অঙ্কগুলি চিনিয়াছি, অথবা নয়ের পর আট, আটের পর সাত অবধারিত আছে, ইহা জানিয়া, চালাকি করিয়া নয়, আট, সাত বলিতেছি। যাহা হউক, ইহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কৌশল করিয়া, তিনি আমাকে ষষ্ঠ

মাইল স্টোনটি দেখিতে দিলেন না; অনন্তর পঞ্চম মাইল স্টোনটি দেখাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কোন্ মাইল স্টোন বল দেখি? আমি দেখিয়া বলিলাম, বাবা এই মাইল স্টোনটি খুদিতে ভুল হইয়াছে; এটি ছয় হইবেক, না হইয়া পাঁচ খুদিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া, পিতৃদেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারীরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বীরসিংহের গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও ঐ সমভিব্যাহারে

ছিলেন ; তিনি আমার চিবুক ধরিয়া "বেশ বাবা, বেশ" এই কথা বলিয়া, অনেক আশীর্বাদ করিলেন, এবং পিতৃদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, দাদা মহাশয়, আপনি ঈশ্বরের লেখাপড়া বিষয়ে যত্ন করিবেন। যদি বাঁচিয়া থাকে, মানুষ হইতে পারিবেক।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ

১। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাল্যকালে কি করিয়া সর্বপ্রথম ইংরাজী সংখ্যা চিনিয়াছিলেন, তাহা নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

২। "জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে, আমি পুনরায় কলিকাতায় আনীত হইলাম।"

—এই আমি কে? কিভাবে তিনি কলিকাতায় আসিলেন?

৩। "যদি বাঁচিয়া থাকে, মানুষ হইতে পারিবেক"—এই উক্তি কাহার? কখন এবং কি অবস্থায় বক্তা এই কথা বলিয়াছিলেন? কে মানুষ হইতে পারিবেক?

৪। বানান ও অর্থ লিখ এবং বাক্য রচনা কর ঃ

কৌতূহলাবিষ্ট, সম্ভাষণ, অবধারিত, সমভিব্যাহার, প্রসঙ্গক্রমে।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

৫। সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ পরীক্ষা, তদনুরূপ, প্রত্যাশা।

৬। বিপরীত শব্দ লিখ ঃ কনিষ্ঠা, অসুস্থ, প্রাতঃকালে, ভাল, দুর্বল, উচ্চৈঃস্বরে, স্পষ্ট, আশীর্বাদ।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

৭। (ক) পাতুল বীরসিংহ গ্রাম হইতে কত দূরে অবস্থিত?

(খ) অন্নপূর্ণাদেবী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কে ছিলেন?

(গ) কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় কে ছিলেন এবং তাঁহার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কি সম্বন্ধ ছিল?

(ঘ) মাইল স্টোন জিনিসটি কি?

(ঙ) কোথায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম শিক্ষালাভ হইয়াছিল?

(চ) বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন দ্বিতীয়বার কলিকাতা যান, তখন তাঁহার বয়স কত?

An illustrative example for an ideal student!

[**লেখক-পরিচিতি** : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে সর্বপ্রথম বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত ছিলেন। উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং সমালোচনা সাহিত্যে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলন। কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, সীতারাম, রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠ প্রভৃতি বহু উপন্যাস ও প্রবন্ধ তিনি রচনা করেন। তাঁহারই লেখা আনন্দমঠে 'বন্দেমাতরম্' গানটি আছে। কাজেই তাঁহাকে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি বলিলে অত্যুক্তি হয় না।]

ভবচন্দ্র গবচন্দ্রের বুদ্ধিবিদ্যার পরিচয় লোক-প্রবাদে এত আছে যে তাহার পুনরুক্তি না করিলেও হয়। গবচন্দ্র বুদ্ধি বাহির হইয়া যাইবে ভয়ে টিপ্‌লে দিয়া নাক-কান বন্ধ করিয়া রাখিতেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট নহেন, পাছে বুদ্ধি বাহির হইয়া যায় - এই ভয়ে সিন্দুকে গিয়া লুকাইয়া থাকিতেন, রাজার কোন বিপদ-আপদ পড়িলে, সিন্দুক হইতে বাহির হইয়া, নাক-কানের পুঁটলি খুলিয়া বুদ্ধি বাহির করিতেন।

একদিন রাজার এইরূপ এক বিপদ উপস্থিত, নগরে একটা শূকর দেখা দিয়াছে। শূকর রাজসমীপে আনীত হইলে রাজা কিছু স্থির করিতে পারিলেন না যে, এ কি জন্তু! বিপদ আশঙ্কা করিয়া মন্ত্রীকে সিন্দুক হইতে বাহির করিলেন। মন্ত্রী টিপ্‌লে খুলিয়া অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, এটা অবশ্য হস্তী; না খাইয়া রোগা হইয়াছে। নচেৎ ইন্দুর, খাইয়া মোটা হইয়াছে।

আর একদিন তুইজন পথিক আসিয়া সায়াহ্নে এক পুষ্করিণীতীরে উপস্থিত হইল। রাত্রে পাকশাক করিবার জন্য সরোবর তীরে স্থান পরিষ্কার করিয়া চুলা কাটিতে আরম্ভ করিল। নগরের রক্ষিবর্গ দেখিয়া মনে করিল যে, যখন পুকুর থাকিতেও তাহার কাছে আবার খানা কাটিতেছে, তখন অবশ্য ইহাদের অসৎ অভিপ্রায় আছে। রক্ষিগণ পথিক তুইজনকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজসন্নিধানে লইয়া গেল। রাজা স্বয়ং এইরূপ গুরুতর সমস্যার কিছুই মীমাংসা করিতে না পারিয়া, পরম ধীমান পাত্র মহাশয়কে সিন্দুকের ভিতর হইতে বাহির করিলেন। তিনি নাক-কানের টিপ্‌লে খুলিয়াই দিব্যচক্ষে কাণ্ডখানা দর্পণের মতন পরিষ্কার দেখিলেন। তিনি আজ্ঞা করিলেন—"নিশ্চিত ইহারা চোর! পুকুরটা চুরি করিবার জন্য পাড়ের উপর সিঁধ কাটিতেছিল। ইহাদিগকে শূলে দেওয়া বিধেয়।" রাজা ভবচন্দ্র মন্ত্রীর বুদ্ধির প্রাখর্যে মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণেই পুষ্করিণী চোরদ্বয়ের প্রতি শূলে যাইবার বিধি প্রচার করিলেন।

কথা এখনও ফুরায় নাই। পুকুরচোরেরা শূলে যাইবার পূর্বে পরামর্শ করিয়া হঠাৎ পরস্পর ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিল। রাজা ও রাজমন্ত্রী এই বিচিত্র কাণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি? তখন একজন চোর নিবেদন করিল—"হে মহারাজ! দেখুন তুই শূলের মধ্যে একটি বড়, একটি ছোট। আমরা জ্যোতিষ জানি। আমরা গণনা করিয়া জানিয়াছি যে, আজ যে ব্যক্তি এই দীর্ঘ শূলে আরোহণ

করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, পুনর্জন্মে চক্রবর্তী রাজা হইয়া সে সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে, আর যে এই ছোট শূলে মরিবে, সে তাহার মন্ত্রী হইয়া জন্মিবে। মহারাজ! তাই আমি দীর্ঘশূলে চড়িতে যাইতেছিলাম, এই হতভাগা আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে, আপনি বড় শূলে মরিয়া সম্রাট্ হইতে চায়।" তখন দ্বিতীয় চোর জোড়হাত করিয়া বলিল—"মহারাজ, ও কে যে, ও চক্রবর্তী রাজা হইবে? আমি কেন না হইব? আজ্ঞা হউক, ও ছোট শূলে চড়ুক, আমি সম্রাট্ হইব, ও আমার মন্ত্রী হইবে।" তখন রাজা ভবচন্দ্র ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া বলিলেন—"কি, এত স্পর্ধা! তোরা চোর হইয়া জন্মান্তরে চক্রবর্তী রাজা হইতে চাহিস্! সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবার উপযুক্ত পাত্র যদি কেহ থাকে, তবে সে আমি। আমি থাকিতে তোরা?" এই বলিয়া রাজা ভবচন্দ্র তখন দ্বারিগণকে আজ্ঞা দিলেন যে—এই পাপাত্মাদিগকে তাড়াইয়া বাহির করিয়া দাও, এবং মন্ত্রীবরকে আহ্বানপূর্বক সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর সাম্রাজ্যের লোভে স্বয়ং উচ্চশূলে আরোহণ করিলেন। মন্ত্রী মহাশয় আগামী জন্মে তাদৃশ চক্রবর্তী রাজার মন্ত্রী হইবার লোভে ছোটশূলে গিয়া চড়িলেন। এইরূপে তাঁদের ভবলীলা সমাপ্ত হইল।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ

১। (ক) মন্ত্রী গবচন্দ্র সিন্দুকে গিয়া লুকাইয়া থাকিতেন এবং কখন তাহাকে সিন্দুক হইতে বাহিরে আনা হইত?

(খ) রক্ষিগণ পথিক দুইজনকে কেন গ্রেপ্তার করিয়া রাজ-সন্নিধানে লইয়া গেল? কি অপরাধে তাহাদের গ্রেপ্তার করা হইল?

(গ) "এটা অবশ্য হস্তী ; না খাইয়া রোগা হইয়াছে"—কে এই কথা বলিয়ছিলেন এবং কি দেখিয়া এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন ?

(ঘ) রক্ষিগণ যাহাদের গ্রেপ্তার কারয়া রাজসন্নিধানে লইয়া গেল, তাহারা কি উপায়ে নিজেদের জীবন রক্ষা করিয়াছিল এবং ভবচন্দ্র ও গবচন্দ্রের শেষ পরিণাম কি হইল ?

২। ভবচন্দ্র রাজা ও গবচন্দ্র মন্ত্রী গল্পটি নিজের ভাষায় লিখ।

৩। অর্থ লিখ এবং বাক্য রচনা কর :

বাজ-সন্নিধানে, অধীশ্বর, পুনরুক্তি, রক্ষিবর্গ, সসাগরা, বিধেয়।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

(ক) লিঙ্গান্তর কর :

মহারাজ, মহাশয়, হতভাগা, অধীশ্বর, পাত্র।

(খ) সন্ধিবিচ্ছেদ কর : পুনরুক্তি, পুনর্জন্ম, অধীশ্বর।

(গ) বিপরীত শব্দ লিখ :

বন্ধ, সন্তুষ্ট, বিপদ, উপস্থিত, নিশ্চিত, দীর্ঘ।

মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) চোরদের কথায় কোন্ শূলে চড়িলে পরজন্মে কি হওয়া যাইবে ?

(খ) কে বলিয়াছিলেন যে ইহাদিগকে শূলে দেওয়া বিধেয়।

(গ) ও কে যে ও রাজচক্রবর্তী হইবে ?—ইহা কাহার উক্তি ?

(ঘ) রাজা, মন্ত্রী এবং চোর দুইটি—ইহাদের মধ্যে কে বেশী বুদ্ধিমান এবং কেন বুদ্ধিমান ?

Humorous episode. Students must appreciate the episode but not the humour.
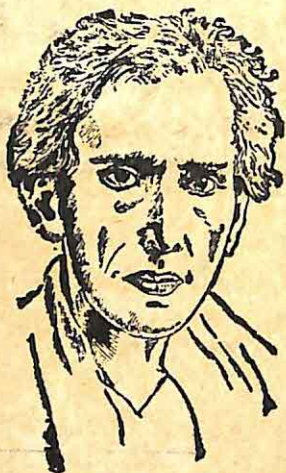
ছিনাথ বহুরূপী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[**লেখক পরিচিতি :** এই গল্পটির লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনি বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার পর, অর্থাভাবে তাহার আর লেখাপড়া হয় নাই। কিছুকাল তিনি রেঙ্গুনে বসবাস করেন। রেঙ্গুন হইতে তিনি দেশে আসিয়া সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীকান্ত, মেজদিদি, গৃহদাহ, বিন্দুর ছেলে, দত্তা, চরিত্রহীন, শেষ প্রশ্ন প্রভৃতি উপন্যাস তাঁহার রচিত। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি লিট উপাধি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'জগত্তারিণী পদক' লাভ করেন। মনস্তত্ত্বের এবং হাস্যরসের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে তাঁহার রচনার আর তুলনা হয় না। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।]

সেদিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না-হইতেই চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। সকাল সকাল খাইয়া লইয়া আমরা কয় ভাই নিত্যপ্রথামত বাহিরে বৈঠকখানায় ঢালা বিছানার উপর রেড়ির তেলের সেজ জ্বালাইয়া বই খুলিয়া বসিয়া গিয়াছি।

বাহিরের বারান্দার একদিকে পিসেমশাই ক্যাম্বিশের খাটের উপর শুইয়া তাঁহার সান্ধ্যতন্দ্রাটুকু উপভোগ করিতেছেন এবং অন্যদিকে বসিয়া রামকমল ভট্টাচার্যি আফিং খাইয়া, অন্ধকারে চোখ বুজিয়া, থেলো হুঁকায় ধূমপান করিতেছিলেন।

ঘরের বাহিরে ঐ জমাট অন্ধকার এবং বারান্দায় তন্দ্রাভিভূত সেই দুটো বুড়ো। ভিতরে মৃদু দীপালোকের সম্মুখে গভীর অধ্যয়নরত আমরা চারিটি প্রাণী।

ছোড়দা ফিরিয়া আসার পর তৃষ্ণায় আমার বুক একেবারে ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কাজেই টিকিট পেশ করিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম। মেজদা তাঁহার সেই টিকিট-আঁটা খাতার উপর ঝুঁকিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, তৃষ্ণা পাওয়াটা আমার আইনসঙ্গত কি না অর্থাৎ কাল-পরশু কি পরিমাণে জল খাইয়াছিলাম।

"ওরে বাবারে খেয়ে ফেল্লেরে"

অকস্মাৎ আমার পিঠের কাছে 'হুম' শব্দ ; এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দা ও যতীনদার সমবেত আর্তকণ্ঠের গগনভেদী রৈ রৈ চিৎকার—"ওরে বাবারে, খেয়ে ফেল্লে রে!"

কিসে ইহাদিগকে খাইয়া ফেলিল, আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবার

২

পূর্বেই মেজদা মুখ তুলিয়া একট বিকট শব্দ করিয়া বিদ্যুৎ বেগে তাঁহার দুই পা সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া সেজ উল্টাইয়া দিলেন। তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল। মেজদা'র ছিল ফিটের ব্যামো। তিনি সেই যে আঁ-আঁ করিয়া প্রদীপ উল্টাইয়া চিৎ হইয়া পড়িলেন, আর খাড়া হইলেন না।

ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইতেই দেখি পিসেমশাই তাঁহার দুই ছেলেকে বগলে চাপিয়া ধরিয়া তাহাদের অপেক্ষাও তেজে চেঁচাইয়া বাড়ী ফাটাইয়া ফেলিতেছেন। এ যেন তিন বাপ-বেটায় কতখানি হাঁ করিতে পারে, তাহার লড়াই চলিতেছে! এই সুযোগে একটা চোর নাকি ছুটিয়া পলাইতেছিল, দেউড়ির সিপাহীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। পিসেমশাই প্রচণ্ড চিৎকারে হুকুম দিতেছেন,—"আউর মারো—উস্‌কো মার ডালো"—ইত্যাদি।

মুহূর্তকালের মধ্যে আলোয়, চাকর-বাকরে ও পাশের বাড়ীর লোকজনে উঠান পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দারওয়ানরা চোরকে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া টানিয়া আলোর সম্মুখে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। তখন চোরের মুখ দেখিয়া বাড়ীসুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল। আরে এ যে ভট্‌চার্যি মশায়! তখন কেহবা জল, কেহবা পাখার বাতাস, কেহবা তাঁহার চোখে-মুখে হাত বুলাইয়া দেয়। ওদিকে ঘরের ভিতরে মেজদা'কে লইয়া সেই ব্যাপার।

পাখার বাতাস ও জলের ঝাপটা খাইয়া রামকমল প্রকৃতিস্থ হইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সবাই প্রশ্ন করিতে লাগিল, "আপনি অমন করে ছুট্‌ছিলেন কেন?" ভট্‌চার্যিমশাই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "বাবা বাঘ নয়, সে একটা মস্ত ভালুক—লাফ মেরে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এল।"

ছোড়দা' ও যতীনদা' বারংবার কহিতে লাগিল, "ভালুক নয়, বাবা

একটা নেকড়ে বাঘ। হুম্ করে লেজ গুটিয়ে পাপোষের উপর বসেছিল!"

মেজদার চৈতন্য হইলে তিনি নিমীলিত চক্ষে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, "দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার!"

কিন্তু কোথায় সে? মেজদার "দি রয়েল বেঙ্গলই হউক, আর রামকমলের মস্ত ভালুকই হউক, সে আসিলই বা কিরূপে, গেলই বা কোথায়? এতগুলো লোক যখন দেখিয়াছে, তখন সে একটা কিছু বটেই!"

তখন কেহ বা বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না। কিন্তু সবাই লণ্ঠন লইয়া ভয়চকিত নেত্রে চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল।

অকস্মাৎ পালোয়ান কিশোরী সিং 'উহ্ বয়ঠা' বলিয়াই এক লাফে বারান্দার উপর। তারপর সেও এক ঠেলাঠেলি কাণ্ড! এতগুলো লোক সবাই একসঙ্গে বারান্দায় উঠিতে চায়, কাহারো মুহূর্ত বিলম্ব সয় না। উঠানের একপ্রান্তে একটা ডালিম গাছ ছিল। বাঘের মতই বটে দেখা গেল। তাহারই ঝোপের মধ্যে বসিয়া একটা বৃহৎ জানোয়ার। বাঘের মতই বটে। চক্ষের পলকে বারান্দা খালি হইয়া বৈঠকখানা ভরিয়া গেল। জনপ্রাণী আর সেখানে নাই। সেই ঘরের ভিড়ের মধ্য হইতে পিসেমশায়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আসিতে লাগিল,—"সড়কি লাও—বন্দুক লাও—।" আমাদের পাশের বাড়ীর গগনবাবুদের একটা মুঙ্গেরি গাদা বন্দুক ছিল; লক্ষ্য সেই অস্ত্রটার উপর। 'লাও' ত বটে, কিন্তু আনে কে? ডালিম গাছটা যে দরজার কাছেই, এবং তাহারই মধ্যে যে বাঘ বসিয়া! হিন্দুস্থানীরা সাড়া দেয় না, তামাশা দেখিতে যাহারা বাড়ী ঢুকিয়াছিল, তাহারাও নিস্তব্ধ।

এমনি বিপদের সময় হঠাৎ কোথা হইতে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সে বোধকরি সুমুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল, হাঙ্গামা শুনিয়া বাড়ী

ঢুকিয়াছে। নিমেষে শতকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল,—"ওরে বাঘ! বাঘ! পালিয়ে আয়রে ছোঁড়া, পালিয়ে আয়!"

প্রথমটা সে থতমত খাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া একা নির্ভয়ে উঠানে নামিয়া গিয়া লণ্ঠন তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল।

দোতলার জানালা হইতে মেয়েরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে এই ডাকাত ছেলেটির পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল। পিসিমা ত ভয়ে কাঁদিয়াই ফেলিলেন; নিচে ভিড়ের মধ্যে গাদাগাদি দাঁড়াইয়া হিন্দুস্থানী সিপাহীরা একটা অস্ত্র পাইলেই নামিয়া আসে, এমন আভাসও দিল।

বেশ করিয়া দেখিয়া ইন্দ্র কহিল, "দ্বারিকবাবু, এ বাঘ নয় বোধ হয়।" তাহার কথাটা শেষ হইতে না হইতেই সেই 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' দুই থাবা জোড় করিয়া মানুষের গলায় কাঁদিয়া উঠিল! পরিষ্কার বাংলা করিয়া কহিল, "না, বাবুমহাশয়, না। আমি বাঘ-ভালুক নই—আমি ছিনাথ বউরূপী।" ইন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভট্‌চার্যি মশায় খড়ম হাতে সর্বাগ্রে ছুটিয়া আসিলেন—"হারামজাদা! তুমি ভয় দেখাবার জায়গা পাও না?"

পিসেমশায় মহাক্রোধে হুকুম দিলেন, "শালাকো কান পাকড়কে লাও।"

কিশোরী সিং তাহাকে সর্বাগ্রে দেখিয়াছিল সুতরাং তাহার দাবি সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া, সে-ই গিয়া তাহার কান ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিল। ভট্‌চার্যি মশায় তাহার পিঠের উপর খড়মের এক ঘা বসাইয়া দিয়া রাগের মাথায় হিন্দী বলিতে লাগিলেন, 'এই হারামজাদা বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া। খোট্টা-মুরুখ বেটারা যেন আমাকে কিলায়কে কাঁঠাল পাকায় দিয়া—"

ছিনাথের বাড়ী বারাসতে। সে প্রতি বৎসর এই সময়টায় একবার করিয়া রোজগার করিতে আসে। কালও এ বাড়ীতে সে নারদ সাজিয়া গান শুনাইয়া গিয়াছিল।

সে একবার ভট্‌চার্যি মশায়ের, একবার পিসেমশায়ের পায়ে পড়িতে লাগিল, কহিল, ছেলেরা অমন করিয়া ভয় পাইয়া প্রদীপ উল্টাইয়া মহামারী কাণ্ড বাধাইয়া তোলায় সে নিজেও ভয় পাইয়া গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইয়া ছিল ; সে ভাবিয়াছিল যে, একটু ঠাণ্ডা হইলেই বাহির হইয়া তাহার সাজ দেখাইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাপার উত্তরোত্তর এমন হইয়া উঠিল যে, তাহার আর সাহসে কুলাইল না।

ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল ; কিন্তু পিসেমশায়ের আর রাগ পড়ে না। পিসিমা নিজে উপর হইতে কহিলেন—"তোমাদের ভাগ্যি ভাল যে সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বার হয়নি। যে বীরপুরুষ তোমরা ; আর তোমার দারোয়ানরা। ছেড়ে দাও বেচারীকে, আর দূর করে দাও দেউড়ির ঐ খোট্টাগুলোকে। ছোট ছেলের যা সাহস, একবাড়ী লোকের তা নেই।" পিসেমশাই কোন কথাই শুনিলেন না, বরং পিসিমার এই অভিযোগে চোখ পাকাইয়া এমন একটা ভাব ধারণ করিলেন যে, ইচ্ছা করিলেই তিনি এ সকল কথার যথেষ্ট সদুত্তর দিতে পারেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের কথার উত্তর দিতে যাওয়াই পুরুষ মানুষের পক্ষে অপমানকর। তাই আরও গরম হইয়া হুকুম দিলেন, "উহার ল্যাজ কাটিয়া দাও।" তখন তাহার সেই রঙীন কাপড়-জড়ানো সুদীর্ঘ খড়ের ল্যাজ কাটিয়া লইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। পিসিমা রাগ করিয়া বলিলেন—"রেখে দাও তোমার ওটা, অনেক কাজে লাগবে।"

Interesting episode, no doubt. But it is in the secondary syllabus. Editors have not maintained the [illegible] of the story.

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন :

১। "সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে।"—কোন্ দিনটির কথা বলা হইয়াছে? সেই দিনটির বর্ণনা দাও।

২। ইন্দ্রের সাহসের পরিচয় দাও।

৩। "ছোট ছেলের যে সাহস, এক বাড়ী লোকের তা নেই"—একথা কে বলিয়াছিলেন? কোন্ ছেলেটি সম্পর্কে একথা বলা হইয়াছে? সেই ছেলেটির সাহসের কি পরিচয় পাইলে, তাহা লিখ।

৪। "ওরে বাবারে, খেয়ে ফেল্লেরে।"—একথা কে বা কাহারা বলিয়াছিল? কিসে উহাদিগকে খাইয়া ফেলিবে? কাহাদিগকে খাইয়া ফেলার কথা বলা হইয়াছে? সত্য কি তাহাদিগকে কিছুতে খাইয়া ফেলিয়াছিল?

৫। "আউর মারো, উসকো মার ডালো।"—কে এই কথা বলিয়াছিলেন? কাহাকে মারিবার আদেশ দেওয়া হইল এবং তাহার কি ফল হইল?

৬। বাক্য রচনা কর :—

তন্দ্রাভিভূত ; মনোযোগ ; বারংবার ; নির্ভয় ; সড়কি।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

৭। পদ পরিবর্তন কর : (বিশেষ্য হইতে বিশেষণে, বিশেষণ হইতে বিশেষ্যে।)

সন্ধ্যা, গম্ভীর, মনোযোগ, আলোক, নিস্তব্ধ, সুখ।

৮। নিম্নলিখিত পদগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ :

তন্দ্রাভিভূত, দীপালোক, অধ্যয়নরত, গগনভেদী, হতভাগা, কাপড়-জড়ানো, বাপ-বেটা।

৯। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

যথেষ্ট, সদুত্তর, উত্তরোত্তর।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১০। নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ কর ঃ

এক ছোট—যা সাহস, এক বাড়া—তা নেই। এতগুলো লোক—একসঙ্গে বারান্দায়—চায়,—মুহূর্ত সয় না।

১১। উক্তিগুলির উপযুক্ত বক্তার নামের মাথায় এই চিহ্ন '✓' দাও :—

(ক) "ওরে বাবারে খেয়ে ফেল্লেরে"—পিসেমশাই/ছোড়দা ও যতীনদা।

(খ) সংক্ষেপে কহিলেন, "দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার।"

—মেজদা/কিশোরী সিং

(গ তুমি ভয় দেখাবার জায়গা পাওনা? ইন্দ্রনাথ/ভট্চাযি মশায়।

(ঘ) রেখে দাও ওটা অনেক কাজে লাগবে।

—ভট্চাযি মশায়/পিসিমা

মৌখিক প্রশ্ন

১২। (ক) মেয়েরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে এই ডাকাত ছেলেটির পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল।

প্রশ্ন ঃ এই ডাকাত ছেলেটি কে? মেয়েরা কি কারণে দুর্গানাম জপিতে লাগিল?

(খ) এই হতভাগা বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া।

প্রশ্ন ঃ হতভাগা বজ্জাত কে? কিভাবে এবং কেন তার গতর চূর্ণ হইয়াছিল?

(গ) ছিনাথের বাড়ী কোথায়?

(ঘ) কাহার আদেশে ছিনাথ বহুরূপীর লেজটি কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল?

(ঙ) কে শ্রীকান্তদের বাড়ীতে নারদ সাজিয়া গান শুনাইয়াছিল?

(চ) "চোরের মুখ দেখিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল।"

প্রশ্ন ঃ এ চোরটি কে? কি কারণে বাড়ীশুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল?

———

তোমাদের কর্তব্য

স্বামী বিবেকানন্দ

[**লেখক-পরিচিতি :** ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী কলিকাতা শহরের সিমলা অঞ্চলে নরেন্দ্রনাথ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য ছিলেন। তিনি সমস্ত বিশ্বে ভারতীয় বেদান্তধর্ম প্রচার করেন। তিনি শিকাগো শহরে ভারতের পক্ষ হইতে ধর্মসভায় যোগদান করেন। তিনি ধর্ম ও বেদান্ত দর্শনের উপর পুস্তক রচনা করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তিনি দেহত্যাগ করেন।]

আমি গরিব—গরিবদের আমি ভালবাসি। আমি এদেশে যাদের গরিব বলা হয় তাদের দেখেছি—আমাদের দেশের গরিবদের তুলনায় এদের অবস্থা অনেক ভাল হলেও কত লোকের হৃদয় এদের জন্য কাঁদছে! কিন্তু ভারতের চিরপতিত বিশ কোটি নরনারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদছে? তাদের উদ্ধারের উপায় কি? তাদের জন্য কার হৃদয় কাঁদে বল। তারা অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পাচ্ছে না—তারা শিক্ষা পাচ্ছে না—কে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে বল? কে দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে? এরাই তোমাদের ঈশ্বর, এরাই তোমাদের দেবতা হোক—এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক! তাদের জন্য ভাব, তাদের জন্য কাজ কর, তাদের জন্য সদা-সর্বদা প্রার্থনা কর—

প্রভুই তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন। তাদেরই আমি মহাত্মা বলি, যাদের হৃদয় থেকে গরিবদের জন্য রক্তমোক্ষণ হয়, তা না হলে সে তুরাত্মা। তাদের কল্যাণের জন্য আমাদের সমবেত ইচ্ছাশক্তি, সমবেত প্রার্থনা প্রযুক্ত হোক—আমরা কাজে কিছু করে উঠতে না পেরে লোকের অজ্ঞাতভাবে দেহত্যাগ করতে পারি—কেউ হয়ত আমাদের প্রতি এতটুকু সহানুভূতি দেখালে না, কেউ হয়ত আমাদের জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌লে না—কিন্তু আমাদের একটা চিন্তা কখনও নষ্ট হবে না। এর ফল শীঘ্র বা বিলম্বে ফলবেই ফলবে। আমার প্রাণের ভেতর এত ভার আসছে আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না—তোমরা আমার হৃদয়ের ভাব মনে মনে কল্পনা করে বুঝে নাও। যতদিন ভারতে কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি। যতদিন ভারতের বিশ কোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর তুল্য থাকবে, ততদিন যে-সব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার ক'রে জাঁকজমক ক'রে বেড়াচ্ছে, অথচ তাদের জন্য কিছু করছে না, আমি তাদের হতভাগা বলি। হে ভ্রাতৃগণ! আমরা গরিব, আমরা নগণ্য, কিন্তু আমাদের মত গরিবরাই চিরকাল সেই পরমপুরুষের যন্ত্র স্বরূপ হয়ে কাজ করেছে। প্রভু তোমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন। সকলে আমার বিশেষ ভালবাসা জানবে।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি।

এখানে 'আমি' কে? লেখক 'দেশদ্রোহী' কাহাদের বলিয়াছেন? কেন বলিয়াছেন?

২। এই প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশিত কর্তব্যগুলি বিশদভাবে আলোচনা কর।

৩। অর্থ লিখ ও বাক্য রচনা কর :

অজ্ঞাতভাবে, ইষ্ট, মহাত্মা, দারিদ্র্য।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

৪। ব্যাসবাক্যসহ সমাস বল :

(ক) দুরাত্মা (খ) রক্তমোক্ষণ (গ) অজ্ঞাতভাবে (ঘ) পরমপুরুষ।

৫। পদ পরিবর্তন কর : (বিশেষ্য হইলে বিশেষণে, বিশেষণ হইলে বিশেষ্যে।)

(ক) হৃদয়, (খ) শিক্ষা, (গ) ঈশ্বর, (ঘ) কল্যাণ, (ঙ) জল, (চ) বিলম্ব, (ছ) পশু, (জ) ক্ষুধার্ত।

৬। মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) "এরাই তোমাদের ঈশ্বর"—এরা হচ্ছে কারা?

(খ) স্বামী বিবেকানন্দের মতে কে দুরাত্মা?

(গ) কাহারা দেশদ্রোহী?

Love for the peoples Sympathy and help for the poor.

কচ্ছপ-জাতক

ঈশানচন্দ্র ঘোষ

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর রাজার অন্যতম অমাত্য পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ রাজা বড় বাচাল ছিলেন ; তিনি কথা বলিতে আরম্ভ করিলে অন্য কেহ কিছু বলিবার অবসর পাইত না। বোধিসত্ত্ব রাজার বাচালতাদোষ দূর করিবার নিমিত্ত সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ঐসময়ে হিমবন্ত প্রদেশে কোন সরোবরে এক কচ্ছপ বাস করিত। দুইটি হংস সেখানে খাদ্যান্বেষণে যাইত। তাহাদের সহিত কচ্ছপের পরিচয় হইল এবং ক্রমে সেই পরিচয় গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইল। তাহারা একদিন কচ্ছপকে বলিল, "সৌম্য কচ্ছপ, আমাদের বাসস্থান হিমবন্ত প্রদেশের চিত্রকূটশৈলস্থ কাঞ্চনগুহায়। উহা অতি রমণীয় ; তুমি আমাদের সঙ্গে সেখানে যাইবে কি ?" কচ্ছপ বলিল, "আমি কি করিয়া সেখানে যাইব ?" "তুমি যদি মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতে পার, কাহাকেও কিছু না বল, তাহা হইলে আমরাই তোমাকে লইয়া যাইব।" "মুখ বন্ধ করিতে পারিব না কেন ? তোমরা আমাকে লইয়া চল।" হংসদ্বয় বলিল, "বেশ, তাহাই করিতেছি।"

তখন হংসেরা একটি দণ্ড আনিয়া কচ্ছপকে উহার মধ্যভাগ কামড়াইয়া ধরিতে বলিল এবং আপনাদের চঞ্চু দ্বারা উহার দুই প্রান্ত ধরিয়া আকাশে উড়িতে লাগিল। হংসদ্বয় কচ্ছপকে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া গ্রাম্য বালকেরা বলিতে লাগিল, "দেখ দেখ, দুইটা হাঁস একটা লাঠি দিয়া একটা কাছিম লইয়া যাইতেছে।"

গ্রাম্য বালকদিগের কথা শুনিয়া কচ্ছপের বলিতে ইচ্ছা হইল, "ওরে দুষ্ট বালকগণ, আমার বন্ধুরা আমাকে লইয়া যাইতেছে, তাহাতে তোদের কিরে ?" তাহার মনে যখন এই ভাবের উদয় হইল, তখন

হংসদ্বয়ের অতি দ্রুতবেগবশতঃ তাহারা বারাণসী নগরস্থ রাজভবনের ঠিক উপরিদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। কচ্ছপ যেমন কথা বলিবার উপক্রম করিল, অমনি দণ্ড হইতে তাহার মুখ স্খলিত হইয়া গেল এবং সে রাজ-ভবনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পড়িয়া দ্বিধা-বিদীর্ণ হইল। ইহাতে রাজভবনে মহা কোলাহল হইল ; সকলেই চিৎকার করিতে লাগিল, 'উঠানে একটা কাছিম পড়িয়া দুই টুকরা হইয়াছে।' ইহা শুনিয়া রাজা বোধিসত্ত্বকে সঙ্গে লইয়া এবং অমাত্যগণ-পরিবৃত হইয়া সেখানে গিয়া কচ্ছপটাকে দেখিলেন এবং বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিতবর, এ কচ্ছপটা পড়িয়া গেল কিরূপে?" বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, "রাজাকে উপদেশ দিবার জন্য এতদিন উপায় প্রতীক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছি। এখন দেখিতেছি, উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে।" তিনি বলিলেন, "এই কচ্ছপের সহিত হংসদিগের বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল সন্দেহ নাই। তাহারা ইহাকে হিমবন্ত প্রদেশে লইয়া যাইবে এই উদ্দেশ্যে দণ্ড কামড়াইয়া ধরিতে বলিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ সেই অবস্থায় ইহাকে লইয়া আকাশে উড়িয়াছিল। তাহার পর কিছু বলিবার ইচ্ছায় এ মুখ সামলাইতে পারে নাই, বলিতে গিয়া দণ্ড ছাড়িয়া দিয়াছে এবং আকাশ হইতে পড়িয়া মারা গিয়াছে।" এই চিন্তা করিয়া তিনি উত্তর দিলেন, "মহারাজ, যাহারা অতি মুখর, এবং জিহ্বাকে সংযত রাখিতে পারে না, তাহাদের এইরূপ দুর্দশা হইয়া থাকে।"

রাজা বুঝিলেন, বোধিসত্ত্ব তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া একথা বলিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি কি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আপনি হউন বা অন্য কেহই হউক, অপরিমিতভাষীদিগের এইরূপ দুর্গতি ঘটিয়া থাকে।" বোধিসত্ত্ব এইরূপে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলে রাজা তদবধি রসনা সংযত করিয়া মিতভাষী হইলেন।

অনুশীলনী

১। কচ্ছপ জাতকের গল্পটি নিজের ভাষায় লিখ।

২। বোধিসত্ব কে এবং কি উপায়ে তিনি রাজাকে মিতভাষী করেন ?

৩। অর্থ লিখ : অমাত্যকুলে, অনুসন্ধান, রমণীয়, চঞ্চু, স্খলিত, সৌম্য।

৪। সন্ধি বিচ্ছেদ কর : খাদ্যান্বেষণে, দুর্গতি, প্রতীক্ষা, দুর্দশা।

৫। বাক্য রচনা কর : রমণীয়, উদয় হইল, কোলাহল, সংযত।

A didactic story to control one's speech.

এভারেষ্ট অভিযান

বিশ্বপতি চৌধুরী

[**লেখক-পরিচিতি :** শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি একজন সুলেখকও। তাঁহার রচিত কয়েকটি পুস্তক পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহার লেখা "কাব্যে রবীন্দ্রনাথ" বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ।]

হিমালয়ের অনেকগুলি শৃঙ্গ আছে। এই শৃঙ্গগুলির মধ্যে যেটি সবচেয়ে উচু, তাহার নাম এভারেস্ট। এই শৃঙ্গটির উচ্চতা উনত্রিশ হাজার একশত একচল্লিশ ফুট। অর্থাৎ পাঁচ মাইলেরও কিছু বেশি। এত উচ্চ শৃঙ্গ পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।

এই শৃঙ্গে আরোহণ করা যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই শৃঙ্গটির উর্ধ্বদেশ চির-তুষারাবৃত। এখানকার বায়ু এত হাল্কা যে, মানুষ নিশ্বাস লইতে পারে না, সেইজন্য নাকের কাছে কৃত্রিম উপায়ে স্বাভাবিক বায়ু সৃষ্টি করিতে হয়। তাহার উপর উঠিবার সময় মাঝে মাঝে তুষার-ঝটিকার উৎপাত আছে। এই তুষার-ঝটিকা একবার বহিতে আরম্ভ করিলে কাহারও নিস্তার নাই। এই ভীষণ ঝটিকা তখন যাহাকে সম্মুখে পাইবে, তাহারই উপর রাশি রাশি তুষার

বর্ষণ করিতে থাকিবে। এই তুষাররাশির মধ্যে চাপা পড়িয়া মৃত্যু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

কিন্তু, এত বিপদ, এত কষ্ট সত্ত্বেও নির্ভীক গিরিপর্যটকের দল এভারেস্ট অভিযানে বার বার বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কত ব্যক্তি এই চেষ্টায় প্রাণ দিল, কত ব্যক্তি পথকষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া ভগ্নশরীর লইয়া ফিরিয়া আসিল, তথাপি চেষ্টার বিরাম নাই। জীবন ইহাদের নিকট তুচ্ছ।

এভারেস্টের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠিবার চেষ্টা বহুবার হইয়াছে। এই চেষ্টা যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই ইউরোপের লোক। প্রথম চেষ্টা হয় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রথম বারের দলটি পঁচিশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠিয়া ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার পর আবার একবার চেষ্টা হয়। এই দ্বিতীয়বারের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। এইবারের অভিযানকারীরা সাতাশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠিতে পারিয়াছিলেন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে আবার একবার চেষ্টা হয়। এই অভিযানের নায়ক হইলেন ম্যালোরি নামে এক ব্যক্তি। ইনি ইহার পূর্বে আরও কয়েকবার বিভিন্ন দলের সহিত এভারেস্টের চূড়ায় উঠিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং এখানকার পথঘাট এবং হালচাল তাঁহার অনেকটা জানা ছিল। এজন্য সকলে তাঁহাকে দলের নায়ক করিয়াছিলেন।

ম্যালোরির দল যাত্রা শুরু করিলেন। সঙ্গে একদল কুলি চলিল। তাহাদের পিঠে বড় বড় বোঝা। এই বোঝাগুলিতে ছিল তাঁবু, খাদ্যদ্রব্য, কম্বল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। সাতাশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠিয়া ইহারা তাঁবু খাটাইলেন। সাতাশ হাজার ফুটের তাঁবু হইতে এভারেস্টের চূড়া মাত্র দুই হাজার ফুট। কিন্তু এই দুই হাজার ফুট উঠাই ভীষণ ব্যাপার। এখানে তুষার ঝটিকা রাতদিন লাগিয়াই আছে।

স্থির হইল ম্যালোরি ও আরভিন চূড়ায় উঠিবেন, আর অন্য সকলে সাতাশ হাজার ফুটের তাঁবুতে তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবেন।

ম্যালোরি ও আরভিন যাত্রা শুরু করিলেন। চূড়ায় পৌঁছিতে আর বোধহয় ছয়শত ফুট মাত্র বাকি। এবারে তাঁদের জয় সুনিশ্চিত। ওডেল প্রভৃতি উৎসাহে ও আনন্দে প্রায় পাগলের মত হইয়া উঠিলেন।

এই ছয়শত ফুট তাঁহারা আর অতিক্রম করিতে পারিলেন না। ম্যালোরি ও আরভিনের এই যাত্রাই শেষ যাত্রা হইল। এভারেস্টের তুষাররাশির মধ্যে তাঁহাদের দেহ কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, তাহা গিরিরাজ হিমালয়ই কেবল বলিতে পারেন।

ইহার পর ১৯৩৩।৩৬।৩৯।৫১ সালে যে সকল অভিযান হয়, সেগুলিতে ২৮ হাজার ফুটের উর্ধ্বে অভিযাত্রীরা উঠিতে পারেন নাই। ১৯৫২ সালের অভিযানে তেনজিং ও ল্যাম্বোয়ার নামে একজন সুইস ২৮,৫৫০ ফুট পর্যন্ত উঠিয়াছিলেন। তারপর ১৯৫৩ সালে তেনজিং ও নিউজিল্যাণ্ডের হিলারি কর্ণেল হাণ্টের নেতৃত্বে অভিযান শুরু করিলেন।

এই দলে ১৩ জন ব্রিটিশ অভিযাত্রী ছিল। সঙ্গে ছিল ৩৬৩ জন ভারবাহী কুলি। ২৯ জন দিশারী আগে আগে চলিল।

২৮ হাজার ফুট পর্যন্ত অধিকাংশ অভিযাত্রী উঠিলেন—এখন বাকি থাকিল এক হাজার ফুট। দলের নেতা হাণ্ট সাহেব হিলারী ও তেনজিংকে পাঠাইলেন ঐ এক হাজার ফুট উঠিয়া বহু বৎসরের প্রয়াসকে সফল করিবার জন্য। তেনজিং সহকারী ও দিশারী হইয়া পূর্বে অনেক অভিযানেই সঙ্গী ছিলেন, তাঁহার অভিজ্ঞতা বহুদিনের।

এভারেস্টের এই অংশে কোথাও পাথর দেখা যায় না। সমস্ত চূড়াটিই কঠিন বরফের আচ্ছাদনে আবৃত। কোথাও পা রাখিবার জায়গা নাই। তাঁহারা কুড়াল দিয়া বরফের গায়ে খাঁজ কাটিয়া পা

রাখিবার ধাপ বানাইয়া লইতে লাগিলেন। এইরূপ এক ধাপে দাঁড়াইয়া আবার কুড়াল চালাইয়া নূতন ধাপ বানাইতে লাগিলেন—এইভাবে প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁহারা অসাধ্য সাধনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিশ্রামের উপায় নাই, অথচ শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন।

অবশেষে তাঁহারা ২৯শে মে তারিখে এভারেস্টের চূড়ায় উঠিয়া সমগ্র পৃথিবীর পানে সগৌরবে দৃষ্টিপাত করিলেন। তেনজিং—রাষ্ট্রসঙ্ঘ, বৃটেন, ভারত ও নেপালের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করিলেন। মানুষের সঙ্গে হিমালয়ের মহাসংগ্রাম শেষ হইল।

তারপর নামিবার পালা। উঠার চেয়ে নামা আরো কঠিন, জয়গৌরব দুইজনকে দ্বিগুণবলে বলীয়ান করিল। সুখের বিষয় ঐ গৌরব তাঁহাদের ধীরতা নষ্ট করে নাই। আবার, কুড়াল দিয়া তুষার সরাইতে সরাইতে তাঁরা ধীরে ধীরে মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে নামিতে লাগিলেন। তাঁহারা যখন নিচের ছাউনীতে নামিয়া আসিলেন, তখন কোলাহলে বিরাট হিমালয় কম্পিত হইয়া উঠিল। সেখানে তো ফুলের মালা ছিল না—সঙ্গীরা নিজ নিজ বাহুর মালা দুইজনের গলায় পরাইয়া দিলেন। তারপর সমতলে নামিয়া এই বিজয়ী বীরদ্বয় দিগ্‌বিজয়ী আলেকজাণ্ডার, সীজার ও নেপোলিয়নের চেয়ে বোধহয় অধিক সম্মান লাভ করিয়াছেন।

অনুশীলনী

১। এভারেস্ট শৃঙ্গের বিবরণ দাও।

২। প্রথমে কে এবং কাহারা এভারেস্ট অভিযানে জীবন বিপন্ন করিয়াছিলেন? তাঁহারা কতদূর সফলতা অর্জন করিয়াছিলেন?

৩। তেনজিং-এর এভারেস্ট অভিযান কিভাবে জয়যুক্ত হইয়াছিল?

৪। টীকা লিখ: আলেকজাণ্ডার, সীজার, নেপোলিয়ান, রাষ্ট্রসংঘ।

Story of a heroic exploit

ডাইনি বুড়ী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[**লেখক-পরিচিতি :** লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক। তিনি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মুরারীপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পথের পাঁচালী, অপরাজিত, ইছামতী, আদর্শ হিন্দু হোটেল—বিভূতিবাবুর নাম-করা গ্রন্থসমূহ। তিনি ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান।]

ভাদ্র মাস। অপু বৈকালবেলা বেড়াইতে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছে। এমন সময় তাহার মা পিছনে ডাকিয়া বলিল—কোথায় বেরুচ্চিস রে অপু? চাল-ভাজা আর ছোলা-ভাজা ভাজছি, বেরিও না যেন—এক্ষুণি খাবি।

অপু শুনিয়াও শুনিল না—যদিও সে চাল-ছোলা ভাজা খাইতে ভালবাসে বলিয়াই মা তাহার জন্য ভাজিতে বসিয়াছে। ইহা সে জানে—তবুও সে কি করিতে পারে? এতক্ষণ কি খেলাটাই চলিতেছিল নীলুদের বাড়ীতে!

অপু এক ছুট দিয়া নীলুদের বাড়ী গিয়া পৌঁছিল। অনেক ছেলে জুটিয়াছিল, অপু আসার আগেই খেলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। নীলু বলিল—চল্ অপু, দক্ষিণ মাঠে পাখীর ছানা দেখতে যাবি? অপু রাজী হইলে দু'জনে দক্ষিণ মাঠে গেল। ধান ক্ষেতের ওপারেই নবাবগঞ্জের বাঁধা সড়কটি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হইয়া যেন মাঠের মাঝখান চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। গ্রাম হইতে এক মাইলের উপরে হইবে। অপু এতদূর কখনও বেড়াইতে আসে নাই—তাহার মনে হইল যেন সমস্ত পরিচিত জিনিসের গণ্ডী ছাড়াইয়া কোথায় কতদূরে নীলুদা তাহাকে টানিয়া আনিল। একটুখানি পরেই সে বলিল—বাড়ী চল নীলুদা, আমার মা বকবে, সন্ধ্যে

হয়ে যাবে, আমি একা গাবতলার পথ দিয়ে যেতে পারবো না।। তুমি বাড়ী চল—

ফিরিতে গিয়া নীলু পথ হারাইয়া ফেলিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা বড় আমবাগানের ধার দিয়া একটা পথ মিলিল। সন্ধ্যা হইবার তখনও কিছু বিলম্ব আছে, আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে—এমন সময় চলিতে চলিতে নীলু হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া অপুর কনুই-এ টান দিয়া সম্মুখ দিকে চাহিয়া ভয়ের সুরে বলিল—ও ভাই অপু!

অপু সঙ্গীর ভয়ের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিল—কিরে নীলুদা? পরে সে চাহিয়া দেখিল যে সুঁড়ি পথটা দিয়া তাহারা চলিতেছে, তাহা কাহাদের উঠানে গিয়া শেষ হইয়াছে—উঠানে একখানা ছোট্ট চালাঘর ও একটা বিলাতী আমড়ার গাছ। তাহার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই নীলু ভয়ের সুরে বলিয়া উঠিল—আতুরী ডাইনীর বাড়ী! অপুর মুখ শুকাইয়া গেল········ আতুরী ডাইনীর বাড়ী···সন্ধ্যাবেলা এ কোথায় তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে? কে না জানে যে ঐ উঠানের গাছ হইতে চুরি করিয়া বিলাতী আমড়া পাড়িবার অপরাধে ডাইনীটা জেলেপাড়ার কোন এক ছেলের প্রাণ কাড়িয়া লইয়া কচুর পাতায় বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, পরে মাছে তাহা খাইয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে বেচারীর আমড়া খাইবার সাধ এ জন্মের মত মিটিয়া যায়। কে না জানে, সে ইচ্ছা করিলে চোখের চাহনিতে ছোট ছেলেদের রক্ত চুষিয়া খাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে। যাহার রক্ত খাওয়া হইল সে কিছু জানিতে পারিবে না, কিন্তু বাড়ী গিয়া খাইয়া দাইয়া সেই যে বিছানায় শুইবে, আর পরদিন উঠিবে না। ঝাপ্‌সা দৃষ্টিতে সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে গেল বাড়ীতে কেহ আছে কি না········এবং চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত শরীর যেন জমিয়া হিম হইয়া গেল—বেড়ার বাঁশের

আগড়ের কাছে অন্য কেহ নয়, একেবারে স্বয়ং আতুরী ডাইনীই তাহাদের—এমন কি শুধু যেন তাহারই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া!

যাহার জন্য অত ভয়, তাহাকে একেবারে সম্মুখেই এভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অপুর সামনে-পিছনে কোন দিকেই পা উঠিতে চাহিল না।

আতুরী বুড়ী ভুরু কুঁচকাইয়া তোব্ড়ানো গালটা যেন আরও ঝুলাইয়া ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার ভঙ্গীতে মুখটা সামনের দিকে একটু বাড়াইয়া দিয়া পায়ে পায়ে তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। অপু দেখিল, সে ধরা পড়িয়াছে, কোন দিকেই আর পালাইবার পথ নাই—হে কারণেই হউক ডাইনীর রাগটা তাহার উপরই—এখনই তাহার প্রাণটা সংগ্রহ করিয়া কচুর পাতায় পুরিবে। মুখের খাবার ফেলিয়া, মায়ের ডাকের উপর ডাক উপেক্ষা করিয়া সে যে আজ মায়ের মনে কষ্ট দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহার ফল এই ফলিতে চলিল। সে অসহায় ভাবে চারদিকে চাহিয়া বলিল, আমি কিছুই জানিনে—ও বুড়ী পিসি—আর আমি কিছু করবো না—আমায় ছেড়ে দাও, আমি এদিকে আর কক্ষনো আসবো না—আজ ছেড়ে দাও ও বুড়ী পিসি!

নীলু ত' ভয়ে প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিল, কিন্তু অপুর ভয় এত হইয়াছিল যে চোখে তাহার জল ছিল না।

বুড়ী বলিল—ভয় কি মোরে, ও বাবারা? মোরে ভয় কি?······ পরে খুব ঠাট্টা করা হইতেছে ভাবিয়া হাসিয়া বলিল, মুই কি ধরে নেবো খোকারা? এস মোর বাড়ীতি এস—আমচুর দেবানি এস—

আমচুর! ডাইনী বুড়ী ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া বাড়ীতে পুরিতে চাহিতেছে—গেলেই আর কি? ডাইনীরা, রাক্ষসীরা যে এ রকম ভুলাইয়া ফাঁদে ফেলে—এ রকম কত গল্প তো মার মুখে শুনিয়াছে।

এখন সে কি করে ? উপায় ?

বুড়ী তাহার দিকে আরও খানিক আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল—ভয় কি মোরে, ও বাবারা ? মুই কিছু বলবো না, ভয় কি মোরে ?···

আর কি, সব শেষ! মায়ের কথা না শুনিবার ফল ফলিবার আর দেরি নাই, হাত বাড়াইয়া তাহার প্রাণটা সংগ্রহ করিয়া এখনি
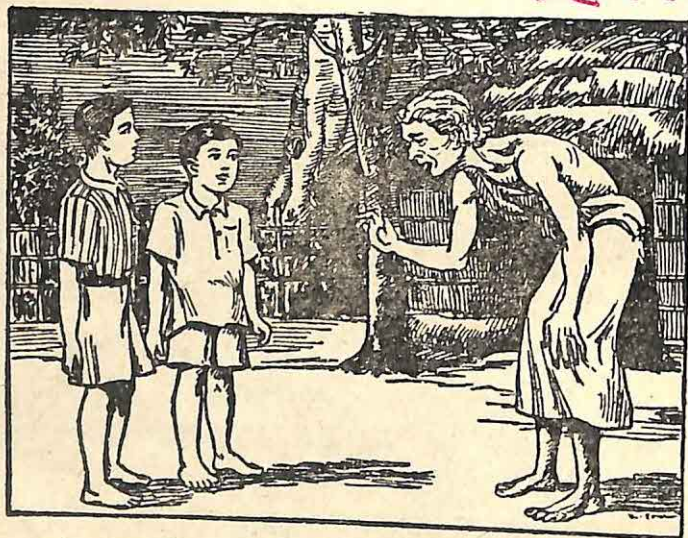
বুড়ী আবার বলিল—ভয় কি মোরে ও বাবারা? মোরে ভয় কি……

কচুর পাতায় পুরিল আর কি! প্রতি মুহূর্তেই তাহার আশঙ্কা হইতেছিল যে এখনই এ বুড়ী হাসিমুখ বদলাইয়া ফেলিরা বিকট মূর্তি ধরিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিবে—রাক্ষসী রাণীর গল্পের মত। বনের অজগর সাপের দৃষ্টিতে কুহকে পড়িয়া হরিণ শিশু নাকি অন্যদিকে চোখ ফিরাইতে পারে না, তাহারও চোখদুটির কুহকমুগ্ধ দৃষ্টি যেরূপ বুড়ীর মুখের উপর দৃঢ়নিবদ্ধ ছিল—সে আড়ষ্ট কণ্ঠে দিশাহারাভাবে বলিয়া উঠিল, ও বুড়ী পিসি, আমার মা কাঁদবে, আমায় আজ আর কিছু বলো

না,— আমি তোমার গাছে কোন দিন আমড়া নিতে আসিনি। আমার মা কাঁদবে—

আতঙ্কে সে নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে……বাড়ী, ঘর, দোর, গাছপালা নীলুর চারিধার যেন ধোঁয়া-ধোঁয়া। কেহ কোন দিকে নাই…কেবল একমাত্র সে আর আতুরী ডাইনীর ক্রুদ্ধদৃষ্টি-মাখানো একজোড়া চোখ………আর অনেক দূরে কোথায় যেন মা আর তাহার চালভাজা খাওয়ার ডাক।

পরক্ষণেই কিন্তু অত্যধিক ভয়ে তাহার এইরূপ মরিয়া সাহস যোগাইল, একটা অস্পষ্ট আর্তরব করিয়া প্রাণভয়ে দিশাহারা অবস্থায় সে সম্মুখের ভাঁট, শেওড়া, রাংচিতার জঙ্গল ভাঙ্গিয়া ডিঙাইয়া সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে যেদিকে দুচোখ যায় ছুটিল…নীলুও ছুটিল তাহার পিছনে পিছনে।

ইহাদের ভয়ের কারণ কি তাহা বুঝিতে না পারিয়া বুড়ী ভাবিল— মুই মাত্তিও যাইনি, ধত্তিও যাইনি—কাঁচা ছেলে, কি জানি মোরে দেখে কেন ভয় পালে সন্দেবেলা? খোকাডা কাদের?

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ

১। 'ডাইনী বুড়ী' নামক গল্পটি সংক্ষেপে লিখ।

২। কি কারণে আতুরী বুড়ীকে 'ডাইনী বুড়ী' বলা হইত? সত্যই কি সে ডাইনী বুড়ী ছিল? তাহার সম্বন্ধে ছেলেদের কি ধারণা ছিল?

৩। আর আমি……বুড়ী পিসি। আমি কে? বুড়ী পিসি কে? বক্তা কি অপরাধ করিয়াছিল?

৪। অপু কিভাবে ডাইনী বুড়ীর বাড়ীতে আসিয়াছিল এবং তাহার সহিত আতুরী বুড়ীর কথোপকথন নিজের ভাষায় লিখ।

৫। পূর্বের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া ব্যাখ্যা কর :—

কেহ কোন দিকে নাই……কেবলমাত্র সে আর আতুরী ডাইনীর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মাখানো একজোড়া চোখ……আর অনেক দূরে কোথায় যেন মা আর তাহার চালভাজা খাওয়ার ডাক।

৬। অর্থ লিখ : বাড়িতি, মূই, কুহকে, সাঙ্গ, বিকটমূর্তি।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

৭। পদ নির্ণয় কর এবং বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :

মা, রাজী, পরিচিত, ভয়, দেশ, অস্পষ্ট।

৮। শব্দার্থ লিখ ও বাক্য রচনা কর :

পরিচিত ; চোখের চাহনি ; আগড় ; উপেক্ষা ; সংগ্রহ করিয়া ; অট্টহাস্য।

৯। মৌখিক প্রশ্ন : (ক) অপু দক্ষিণ মাঠে কি দেখিতে গিয়াছিল ?

(খ) আতুরী বুড়ীর বাড়ীর উঠানে কিসের গাছ ছিল ?

(গ) অপু চাল-ছোলাভাজা খাইবার লোভ ত্যাগ করিয়া কি কারণে নীলুদের বাড়ীতে গিয়াছিল ?

A story of suspense for the children. Moreover, the curiosity for the unknown is a common characteristics of the children.

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

জীবনকৃষ্ণ শেঠ

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নাম তোমরা সকলেই জান। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন ও সংগ্রামের সহিত এই অক্লান্তকর্মী, মহাপ্রাণ বীরপুরুষের নাম চিরকালের জন্য সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। আজ হইতে সহস্র বৎসর পরেও নবভারত রচনার ইতিহাসে যাঁহাদের কথা স্বর্ণাক্ষরে সমুজ্জল থাকিবে, নেতাজী বসু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। মহাকাল তাঁহার ললাটে অমরত্বের জয়টীকা পরাইয়া দিয়াছেন, সে টীকা মুছিবে কে ?

একদা তিনি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন "আশা, উৎসাহ, ত্যাগ ও বীর্য লইয়া আমরা আসিয়াছি সৃষ্টি করিতে, কারণ সৃষ্টির মধ্যেই আনন্দ। তনু-মন-প্রাণ-বুদ্ধি ঢালিয়া দিয়া আমরা সৃষ্টি করিব। নিজেদের মধ্যে যাহা কিছু শিব আছে—তাহা আমরা সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিব। আত্মদানের মধ্যে যে আনন্দ সে আনন্দে আমরা বিভোর হইব, সেই আনন্দের আস্বাদ পাইয়া পৃথিবীও ধন্য হইবে।"

এই আদর্শই তাহার জীবনব্যাপী কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই মহাবীর যোদ্ধা আনন্দের মধ্যে আত্মদান করিয়াছেন। তাঁহার এই আত্মদানের অপূর্বতা দেখিয়া আমরা ধন্য হইয়া গিয়াছি।

নেতাজী সুভাষ শক্তি, সাহস ও কর্মনৈপুণ্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। বস্তুতঃ বীরকেশরী বিবেকানন্দের ত্যাগ ও সাধনা, মহারাজ শিবাজীর কর্মকৌশল ও চাতুর্য, এবং রাণা প্রতাপ সিংহের সাহস ও

অধ্যবসায় তাঁহার মধ্যে সংহত হইয়াছিল। এমন চরিত্র পৃথিবীতে বিরল।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারী উড়িষ্যার রাজধানী কটকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ উকিল জানকীনাথ বসুর তিনি ষষ্ঠ সন্তান। পিতা সুশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার দ্বারা সন্তানদের মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা বহুলাংশে সফল হইয়াছিল। অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুর নাম তোমরা জান; স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁহার ত্যাগ ও সাধনার কথা আজ সুবিদিত।

সুভাষচন্দ্র কৃতী ছাত্র ছিলেন। বি. এ পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে তিনি প্রথম শ্রেণীর অনার্স লাভ করেন। বি. এ পরীক্ষায় ডিগ্রী লাভ করার পর তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। তখনকার দিনে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ সরকারী চাকরি লাভ করাই ভারতীয় যুবকদের চরম এবং পরম লক্ষ্য ছিল। সুভাষচন্দ্র এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। কিন্তু বিজাতীয় সরকারের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বিধাতা তাঁহাকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ নেতৃত্বপদ দিয়া পাঠাইয়াছেন, দেশকে ও জাতিকে গড়িয়া তুলিবার জন্য যাঁহাকে নিরন্তর কঠোর সাধনায় ব্রতী থাকিতে হইবে এবং যিনি বিপ্লবের মহা-অধিকার লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে শোষণকারী বিজাতীয় ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে?

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে এই তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা যুবক ভারতবর্ষের বিজাতীয় শাসনতন্ত্রের অমানুষিক অত্যাচার ও অন্যায়ের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, যেমন করিয়াই হউক এই শাসনতন্ত্রের অবসান ঘটাইতেই হইবে—দেশকে, জাতিকে পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতেই হইবে,—

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।'

কবিগুরুর এই বাণী তাঁহার জীবনের আদর্শ হইয়া উঠিল। দেশে ফিরিয়া ইহারই সাধনকল্পে তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে নামিয়া পড়িলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তখন সর্বজনপ্রিয় নেতা। তাঁহারই শিষ্যরূপে—অন্যতম সহকারীরূপে তিনি জাতিগঠনের কাজে ও স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিলেন।

তখন দেশ জুড়িয়া অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলনের নেতা। তাঁহার আহ্বানে সহস্র সহস্র দেশবাসী এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন—তরুণ সুভাষচন্দ্র এই আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ফলে বিজাতীয় সরকার কর্তৃক তিনি ছয়-মাসের জন্য কারারুদ্ধ হইলেন।

তার পরের ইতিহাস নিরন্তর সংগ্রামের এক অভূতপূর্ব কাহিনী। রোগ শোক বেদনার মধ্য দিয়া আশানৈরাশ্য বন্ধুর স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে ধীর, অবিচলিত পদে এবং অটোলোন্নতশিরে তিনি যাত্রা করিয়াছেন। এমন হইয়াছে যে রোগে তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছে, তবুও মুহূর্তের জন্য তিনি দেশের কথা, জাতির কথা ভুলিতে পারেন নাই। ক্রমে তাঁহার ত্যাগ, তিতিক্ষা ও অদম্য কর্মশক্তি তাঁহাকে জাতির পুরোধা-রূপে দাঁড় করাইয়া দিল।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হরিপুরায় জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে তিনি সভাপতিরূপে নির্বাচিত হইলেন। পর বৎসর ত্রিপুরী কংগ্রেসেও তিনি সভাপতিত্ব করেন। এই সময় তিনি অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন, তবুও কর্তব্যের আহ্বানে শায়িত অবস্থায় স্ট্রেচারে করিয়া তিনি সভাস্থলে গমন করেন।

এই অধিবেশনে স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মপন্থা লইয়া অন্যান্য

নেতৃবৃন্দের সহিত তাঁহার মতানৈক্য ঘটায় তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করিলেন। মহাত্মাজী প্রবর্তিত অহিংস নীতি পরিত্যাগ করিয়া তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বাছিয়া লইলেন। মনে রাখিতে হইবে, মত ও পথের ভিন্নতা সত্ত্বেও তিনি কোনদিন মহাত্মাজীর স্নেহাশীষ হইতে বঞ্চিত হন নাই।

ইহার পরে যাহা ঘটিল, তাহা যেমনই অসাধারণ, তেমনই অভূতপূর্ব। যে ঘটনার কথা কেহ কোনদিন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই, তাহাই ঘটিয়া গেল। তাঁহার চমকপ্রদ কার্যাবলী মুহূর্তের মধ্যে তাঁহাকে বিশ্ববাসীর চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরিল—তিনি ঐতিহাসিক বিরাট মানবরূপে পরিগণিত হইলেন।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ। সুভাষচন্দ্র তখন তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে অন্তরীণ অবস্থায় বাস করিতেছিলেন। একেবারে নির্জন বাস — বাহিরের কোন লোক ত নহেই, এমন কি আত্মীয়-স্বজনও সব সময় তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না। এমনই সময়ে একদিন তাঁহার জীবনের পরমক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন প্রভাতে জাগ্রত ভারতবাসী মহাবিস্ময়ে ও আশ্বস্তচিত্তে শুনিল যে, সুভাষচন্দ্র কলিকাতা হইতে গোপনে অন্তর্ধান করিয়াছেন—কোথায় ? কেহ জানে না। বিদ্যুতের মত এ-সংবাদ ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িল—বিজাতীয় শাসকবর্গের বিরাট গোয়েন্দা-বিভাগ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু সবই বৃথা—সুভাষচন্দ্র তখন সীমান্ত অতিক্রম করিতেছেন ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে। কেহই তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। বিধাতার অভীপ্সিত কার্যের জন্য যাঁহার আবির্ভাব বিধাতাই তাঁহাকে রক্ষা করেন। মানুষের সাধ্য কি তাঁহার গাত্র স্পর্শ করে !

দূর অজানিত ভয়ংকর, রুক্ষবন্ধুর সীমান্ত পার্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া যাত্রা করিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব সুভাষচন্দ্র।

সেদিন প্রভাতের শুভ্রালোকে সীমান্তবাসীরা হয়তো দেখিয়াছিল সে অগ্রপথিককে। দেখিয়াছিল অপূর্ব সুন্দর মূর্তি, বদ্ধ ওষ্ঠাধরে যাঁহার অবিচলিত দৃঢ়তা। এ কোন্ পথিক ?—

"স্বচ্ছ তরুণ সৌম্যমুখে
অন্তরের দীপ্তি পড়ছে ফুটে ;
চোখ যেন স্তব্ধ হয়ে আছে
সকাল বেলার তীর্থযাত্রীর গান।
সুকুমার উজ্জ্বল দেহ
দেবশিল্পী কুঁদে বের করেছে
বিদ্যুতের বাটালি দিয়ে !"

ভারতবর্ষের বাহির হইতে সশস্ত্র সংগ্রামের আয়োজন করিতে হইবে। তিনি তাই ভারতবর্ষের বাহিরে যাত্রা করিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গৌরবসমৃদ্ধ নবতর অধ্যায় সংযোজিত হইল। এ অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ পুরুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

প্রথমে তিনি বার্লিনে গিয়া হিটলারের সহিত দেখা করেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার সাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিত হইতে পারেন নাই। তারপরে তিনি জাপান-সম্রাট মিকাডোর বিশেষ সহায় লাভ করিলেন। জাপানে অন্যতম বিপ্লবী নেতা শ্রীরাসবিহারী বসুকে তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু ও উপদেষ্টারূপে লাভ করিলেন। তাঁহাদের বিপুল প্রচেষ্টায় ভারতের মুক্তি-ফৌজ গঠিত হইল—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই তাহাতে যোগ দিলেন।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ্ সরকার গঠিত হইল। সুভাষচন্দ্র হইলেন তাহার সর্বাধিনায়ক।

'জয় হিন্দ্,' 'দিল্লী চলো' গর্জনে এক বিপুল সৈন্যবাহিনী তাঁহার

নেতৃত্বে ভারতের পূর্ব-সীমান্ত আক্রমণ করিয়া মণিপুর রাজ্যের এক বিস্তীর্ণ এলাকা অধিকার করিয়া লইল। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান করিল। ভারতের পূর্বগগন সহসা এক নবীন আভায় উদ্ভাসিত হইল। সেদিন প্রভাতে নবীন তপন নূতন জীবন বপন করিল এ কাহিনী নহে—এ স্বপ্ন নহে, এ সত্য। ভারত সভয়-বিস্ময়ে সেই মহা-আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিল—শুনিল গগন পূর্ণ করিয়া অভূতপূর্ব এক মহাবাণী উত্থিত হইতেছে—'দিল্লী চলো'।

ব্রিটিশের সহিত এই সংঘর্ষের প্রত্যক্ষ ফল যাহাই হউক না কেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি ইহাতে টলিয়া উঠিল। শাসকবৃন্দ বুঝিলেন যে ভারত তাঁহাদের ছাড়িতে হইবে। এই মহা-আবির্ভাবের বিপক্ষে দাঁড়াইবার মত শক্তি ও দৃঢ়তা তাঁহাদের নাই। তারপরেই আসিল সেই মহাদিন—পরম শুভলগ্ন—১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট। ভারতবর্ষ লাভ করিল স্বাধীনতা। দুইশত বৎসরের পরাধীনতার অবসান হইল। সেই মহান নেতার মহতী প্রচেষ্টা সার্থক হইল।

কিন্তু সেই মহাপুরুষ আজিও ফিরেন নাই। মহারহস্যাবৃত তাঁহার মৃত্যু-কাহিনী। ভারতবর্ষ আজও সাগ্রহে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার এক প্রশ্ন – সে পথিক আর ফিরিবেন কি ?

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন :

১। "ভারতবর্ষ লাভ করিল স্বাধীনতা"—ভারতবর্ষ কবে স্বাধীনতা লাভ করিল ? সুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী বর্ণনা কর।

২। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বাল্যজীবন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। "নিজেদের মধ্যে যাহা কিছু শিব আছে—তাহা আমরা সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিব।"—এই উক্তির তাৎপর্য কি ?

৪। নেতাজী সুভাষ শক্তি, সাহস ও কর্মনৈপুণ্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। এই উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন কর।

৫। "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে"—এই বাণী কাহার? কিভাবে এই বাণী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনের আদর্শ হইয়া উঠিল?

৬। কেন এবং কোথায় এবং কখন হইতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বাছিয়া লইলেন?

৭। এ কাহিনী নহে—এ স্বপ্ন—এ সত্য। কোন্‌টি কাহিনী নহে বা স্বপ্ন নহে পরন্তু খাঁটি সত্য?

৮। কিভাবে আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হইল?

৯। পূর্বের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া ব্যাখ্যা কর:

(ক) আত্মদানের মধ্যে যে আনন্দ যে আনন্দে, আমরা বিভোর হইব, সেই আনন্দের আস্বাদ পাইয়া পৃথিবীও ধন্য হইবে।

(খ) বস্তুতঃ বীরকেশরী বিবেকানন্দের ত্যাগ ও সাধনা, মহারাজ শিবাজীর কর্মকৌশল ও চাতুর্য এবং রাণা প্রতাপসিংহের সাহস ও অধ্যবসায় তাঁহার মধ্যে সংহত ছিল।

(গ) কবিগুরুর এই বাণী তাঁহার জীবনের আদর্শ হইয়া উঠিল।

১০। অর্থ লিখ ও বাক্যে ব্যবহার কর:

সংযুক্ত, সমুজ্জ্বল, বিরল, প্রচেষ্টা, প্রতীক্ষা, প্রতীক, সুবিদিত, নাগপাশ, তিতিক্ষা, শুভ্রালোকে, প্রত্যক্ষ।

১১। টীকা লেখ:

হিটলার, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, শ্রীরাসবিহারী বসু, আজাদ হিন্দ ফৌজ, মহাত্মাজী।

১২। পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ:

(ক) ব্যাস বাক্য সহ সমাস লেখ:—

অক্লান্তকর্মী; স্বর্ণাক্ষরে; বীরকেশরী; জয়টীকা; নিরন্তর; রাজনীতিক্ষেত্র; আশানৈরাশ্য বন্ধুর; অভূতপূর্ব।

(খ) উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

বিধাতার—কার্যের জন্য যাঁহার আবির্ভাব—তাহাকে রক্ষা করেন। মানুষের সাধ্য কি তাঁহার স্পর্শ করে ?

১৩। মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) মহাকাল কাহার ললাটে অমরত্বের জয়টীকা পরাইয়া দিয়াছেন ?

(খ) কোন্ খ্রীষ্টাব্দে এবং কোন্ তারিখে এবং কোথায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ?

(গ) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পিতার নাম কি ?

(ঘ) অসহযোগ আন্দোলন প্রথম কে প্রবর্তন করেন ?

(ঙ) ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হরিপুরার জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে কে সভাপতি হইয়াছিলেন ?

(চ) কত খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র আন্তর্ধান করেন ?

(ছ) আজাদ হিন্দ সরকারের প্রথম সর্বাধিনায়ক কে ?

(জ) সে পথিক আর ফিরিবেন কি ? এ পথিকটি কে ?

Inspiring life story of a national hero.

দার্জিলিংয়ের পথে

প্রবোধ কুমার সান্যাল

[লেখক-পরিচিতি—প্রবোধকুমার সান্যাল ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক। প্রথম জীবনে তিনি চাকুরি গ্রহণ করেন এবং পরে চাকুরি ছাড়িয়া সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার লেখা মহাপ্রস্থানের পথে, প্রিয়বান্ধবী, নদ ও নদী—পাঠকমহলে বিশেষ আদৃত।]

আমার বিশ্বাস শীতকাল ভ্রমণের উপযুক্ত কাল। ডিসেম্বরের দার্জিলিং শুনলে লোকে অবশ্য একটু আড়ষ্ট হয়, কিন্তু দার্জিলিং নভেম্বর-ডিসেম্বরে অতি মনোরম। কিছু বসবাসের সুবিধা, গায়ে গরম বস্ত্রাদি ও সময়মতো গরম জল—এই হ'লেই যথেষ্ট। সমগ্র ডিসেম্বর হ'ল দার্জিলিং, সিকিম ও ভূটানে কমলালেবুর মাস। যেখানে যত উপত্যকা ও অধিত্যকা—কমলালেবুর অগণিত সংখ্যক বাগান লাল হয়ে ওঠে। এক এক স্থলে লেবুর পাহাড় তৈরি হয় রপ্তানির জন্য। চারিদিকে ঝুড়ি ঝুড়ি রাশি রাশি লেবু। সর্বাপেক্ষা দরিদ্র যারা, তারাও খাচ্ছে এ-বাগান ও-বাগান ঘুরে। বড় ও ভাল লেবু বিক্রি হচ্ছে টাকায় ১৫টা। হাত পেতে চাইতে পারলে পাহাড়ীদের হাতে দুটো ফাউও মেলে।

শিলিগুড়িতে পৌঁছে দেখি এখন নতুন শহর। বড় বড় রাস্তা, নতূন শহর, অনেক দূর পর্যন্ত লোকবসতি বিস্তার লাভ করেছে। দূর দিয়ে চলে গেছে মহানন্দার পুল। স্টেশন থেকে মাইল পাঁচেক

দূরে উত্তরবঙ্গের নবনির্মিত বিশ্ববিদ্যালয়! বাগডোগরার পথও তেমনি মসৃণ ও মনোরম। শিলিগুড়িতে এখন যেন ভারতের সকল সম্প্রদায় এসে মিলেছে। সমতল ভারত এখানে মিলেছে পার্বত্য পূর্ব-ভারতের সঙ্গে। নিউ জলপাইগুড়ি নতুন স্টেশন, কিন্তু শিলিগুড়ি যেন অভিনবত্বে ভরপুর। আসাম, নেফা, মণিপুর, নাগাভূমি,—যেখানেই যাও, শিলিগুড়িকে বাদ দেওয়া চলবে না। উত্তরে সিকিম, দার্জিলিং এবং কালিম্পং। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার - তাও শিলিগুড়ি হয়ে, সম্প্রতি আরেকটি চমৎকার মোটর-পথে যাওয়া যাচ্ছে ভূটানে। শিলিগুড়ি থেকেই ভূটান সরকারের একটি মোটর বাস ছাড়ে অপরাহ্নে এবং ঘণ্টা চারেকের মধ্যে কুন্ত সোলিং গিয়ে পৌছায়। যাঁরা কথায় কথায় পশ্চিমে হাওয়া খেতে যান, তাঁরা একবার উত্তরবঙ্গে ঘুরে এলে নতুন ধরনের আনন্দ পাবেন।

আমি সোজা চলে এলুম কার্সিয়াংয়ে। এখন ডিসেম্বর অর্থাৎ মরশুমের কাল নয়। কিন্তু রৌদ্রে আর মেঘের ছায়ায় ঝলমল করছে এই ছোট পার্বত্য জনপদটি। ধর্মশালাটা প্রায় শূন্য। বৌদ্ধভাস্কর লোকের আনাগোনা কম, বাজার ও রেল-স্টেশনের আশেপাশে শুধুই যা লোকজনের চলাফেরা। এ সময়ে শীতের শাক-সব্‌জি, মাছ-মাংস যথেষ্ট। কমলালেবুতে বাজার ভরা। স্টেশন পল্লী থেকে উপর দিকে উঠে গেলে হিমালয়ের সুন্দর শোভা। সমগ্র দার্জিলিং জেলা এবং সিকিম রাজ্যই যেন কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্য সম্ভোগ নিয়ে বসে থাকে। আমি উঠে গেলুম শ'চারেক ফুট উঁচুতে, ডাউহিল রোডের উপরে একটি বাংলো-বাড়িতে—যার উত্তর দিকের প্রথম দৃশ্য সুদূর প্রসারিত কাঞ্চনজঙ্ঘা। এটি কার্সিয়াংয়ের শ্রেষ্ঠ সময়। একটানা বৃষ্টি, তুষার, ঝড় বা পাহাড়ের ধস নামা - কোনটা এ সময় ঘটে না। ইদানীং আমি নিজে গ্রীষ্ম, বর্ষা বা শরতে দার্জিলিংয়ে আসিনে। গরমের

সময়ে ঠাণ্ডা হাওয়ায় কয়েকদিন বাস করে আবার যাঁরা গরমে ফিরে যান, তাঁরা ঠকেন। বর্ষার সময় পাহাড় অতীব কষ্টকর। এ ছাড়া ধস নামার ভয় থাকে বর্ষা ও শরতের প্রথম দিকে। গত তু'বছরে দার্জিলিং বা জলপাইগুড়িতে ধস ও বন্যায় যে কাণ্ড ঘটল, তা কেউ ভোলেনি। তাছাড়া, গ্রীষ্মে দার্জিলিংয়ে জলের অভাব, সিনচলের বাগানে জলাধার তু'টি যায় শুকিয়ে। শহরে জল সরবরাহে নানা বিঘ্ন ঘটে। কিন্তু শীতের সময়ে কিছুদিন দার্জিলিং জেলায় বাস করলে প্রকৃতই স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে।

চার-পাঁচ দিন পরে দার্জিলিং-এ এসে উঠলুম। এখন হোটেলগুলি প্রায়ই খালি। ফোড়নের মতো তু'চারজন টুরিস্ট আসা-যাওয়া করছে —তারা বিদেশী।

যাই হোক, এ সেই দার্জিলিং। এদিকে সেই জলাপাহাড়, আর উত্তর অঞ্চলে বার্চ হিল। আমি বেছে নিলুম জল পাহাড়ের এক জনশূন্য হোটেল,—সেই পুরনো গির্জার ঘড়িটা রইল আমার ঠিক সামনে। এদিক্‌টা দার্জিলিংয়ের অভিজাত পল্লী। সন্দেহ নেই, এখন শীত একটু বেশী এবং শীত এখন থেকে রোজই বাড়বে। এরপর শিলাবৃষ্টি, তুষারপাত এবং জানুয়ারীতে বরফ। এখনই বেলা ৫টার পর রাস্তাঘাট এবং চাঁদমারির মস্ত বড় বাজার জনবিরল হতে আরম্ভ করেছে। ঠাণ্ডা জলে এখনই হাত দিতে কষ্ট হয়। প্রায় সকলেরই মাথায় উঠছে কান-ঢাকা পশমের টুপি। ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে Transistor হাতে নিয়ে এখন আর তরুণ-তরুণীরা পথে-ঘাটে ঘুরছে না, চড়ুইভাতির জন্য ছুটছে না এবং প্রজাপতির পাখায় রংয়ের তুলিও কেউ বুলোচ্ছে না। তবু ডিসেম্বরের দার্জিলিং অনবদ্য। আকাশ রৌদ্রে ভরা, পাহাড়ে পাহাড়ে বনময় শোভা, সুন্দর নিরিবিলি পথ-ঘাট, চারিদিকে সামগ্রীর প্রাচুর্য—আর উত্তর দিকে? পরলোকগত নন্দলাল

বসুর আঁকা সেই কাঞ্চনজঙ্ঘার দেবাদিদেব যেন আরও কাছে সরে এসেছেন। রৌদ্রে মেঘে ছায়ায় বর্ণাঢ্যতায় দিগ্‌দিগন্তের হিমালয় মনকে মায়াচ্ছন্ন করে রাখে।

ওরই মধ্যে একদিন গেলুম Himalayan Mountaineering Institute-এ। বন্ধুবর কর্ণেল নরিন্দর কুমার—যিনি এভারেস্ট শৃঙ্গ বিজয়কালে কমাণ্ডার কোহলির ডেপুটি ছিলেন—তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি এখানকার প্রিন্সিপ্যাল। এটি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পর্বতারোহণের শিক্ষাকেন্দ্র। এ এক বিরাট প্রতিষ্ঠান। এর প্রথম শিক্ষক হ'লেন তেনজিং। এখানে এসে আরেকবার ঘুরে ঘুরে কর্ণেল তাদের যাদুঘর, শিক্ষানবীশদের বাসস্থান, জার্মানির হিটলারের ব্যবহার-করা সেই প্রসিদ্ধ টেরিস্কোপ যন্ত্রটি—একে একে তিনি সবই দেখালেন। ফিরবার পথে চিড়িয়াখানার প্রাক্তন রুশ নায়ক ক্রুশ্চবের দেওয়া সেই উখুরি বাঘ কয়টিকেও আবার দেখে নিলুম।

দার্জিলিং ছাড়বার আগে একদিন প্রত্যূষে গিয়ে উঠলুম সেই ঘুম শহরের উপর দিয়ে টাইগার হিল-এর চূড়ায়। হ্যাঁ, এবার ঠাণ্ডা বটে। এটা ১০ হাজার ফুট উপরে। উপরে উঠে দেখি, গরম পোশাকে ঢাকা মেয়ে-পুরুষ ঠাণ্ডায় অস্থির হয়ে নাচছে। নাচলে যদি একটু গা গরম হয়। তাই ব'লে ধেই ধেই নাচ? এতোই কি ঠাণ্ডা? জিরো ডিগ্রির কতই বা নীচে? কিন্তু পোড়া কপাল আমাদের। নীচের দিকে সমতল ভূভাগের দিগন্তে মেঘে ঢাকা রয়ে গেল শেষ রাতের সেই শিশুসূর্য! যখন তার আবির্ভাব ঘটল, তখন থালা বড় হয়েছে। তিন-চারদিন বেশ কাটে দার্জিলিংয়ে। শীতের দিন, আরও সুন্দর।

An uncommon novel experience in travelling -

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন :

১। "দার্জিলিংয়ের পথে" নামক ভ্রমণ-কাহিনীটি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লিখ।

২। শীতকালে দার্জিলিং ভ্রমণের পক্ষে সুবিধাজনক কেন? কি কি সুবিধা লিখ।

৩। দার্জিলিংয়ের পথে লেখক কোন্ কোন্ দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়াছিলেন, তাহার তালিকা প্রস্তুত কর।

৪। ইহাদের বিষয় যাহা জান লিখ :

শিলিগুড়ি; কার্শিয়াং; কাঞ্চনজঙ্ঘা; সিন্‌চল; Himalayan Mountaineering Institute; টেলিস্কোপ; টাইগার হিল।

৫। অর্থ লিখ :—

অভিনবত্বে, তুষারপাত, মায়াচ্ছন্ন, শিশুসূর্য্য।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

৬। পদ নির্ণয় কর এবং বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :

সুবিধা; মসৃণ; গরমের সময়; উন্নতি; আবির্ভাব।

৭। নিম্নলিখিত পদগুলির মধ্যে বিশেষ্যকে বিশেষণে এবং বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিণত কর :

(ক) বিশ্বাস, আড়ষ্ট, দারিদ্র্য, নূতন, বিস্তার, আনন্দ, পার্বত্য, ঝড়, অভাব, উন্নতি, বিদেশী, প্রাচুর্য, প্রতিষ্ঠান, আবির্ভাব।

৮। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) বাগডোগরা কি এবং কোথায়?

(খ) কুম্ভ সোলিং কোথায়?

(গ) লেখক যে বাংলো বাড়িতে উঠিয়াছিলেন তাহা কোন্ রাস্তার উপর?

(ঘ) নরিন্দর কুমার কে?

(ঙ) টাইগার হিলের চূড়ায় মেয়ে-পুরুষরা নাচ্‌ছিল কেন?

নির্দেশ ঃ সম্প্রতি তুমি যদি কোথাও বেড়াইতে গিয়া থাক—তাহা হইলে সেখানে যাহা দেখিয়াছ তাহা জানাইয়া তোমার বন্ধুর নিকটে একখানি পত্র লিখ।

বিদ্যাসাগর

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

[**লেখক-পরিচিতি**—শ্রীবলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় "বনফুল" ছদ্মনামে সাহিত্য সেবা করেন। উপন্যাস ও ছোট গল্পে ইহার অসামান্য কৃতিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। ইনি বিহারের ভাগলপুরে বাস করিলেও বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগের তুলনা হয় না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি চিকিৎসক।]

প্রথম দৃশ্য

[মার্শাল সাহেবের অফিস। সাহেব টেবিলে বসিয়া কাজ করিতেছেন। বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পায়ে চটি, গায়ে সাদা চাদর। সাহেব সসম্ভ্রমে তাঁহাকে সংবর্ধনা করিলেন। সাহেব বাংলা শিখিয়াছেন, শুদ্ধ কেতাবী বাংলা বলেন।]

মার্শাল। নমস্কার, আসুন পণ্ডিত।

বিদ্যাসাগর। আমি আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি।

মার্শাল। কি বলুন ?

বিদ্যাসাগর। ছুটি চাই। আমার ভাইয়ের বিয়ে, মা বাড়ীতে যেতে লিখেছেন।

মার্শাল। ছুটি ? কত দিনের ?

বিদ্যাসাগর। অন্ততঃ তিন-চার দিনের।

মার্শাল। তাহা তো এখন অসম্ভব, কলেজের কাজকর্ম চলিবে কিরূপে ?

[বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন]

বিদ্যাসাগর। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। বিয়ে ছাড়া আমার নিজেরও একটু দরকার আছে বাবা-মায়ের কাছে।

মার্শাল। খুব জরুরি?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ, জরুরি। তাঁদের জিজ্ঞাসা না-করা পর্যন্ত আমি একটা কাজে হাত দিতে পারছি না।

মার্শাল। [বিস্মিত হইয়া] আপনি কি এখনও সকল কার্য তাঁহাদের অনুমতি অনুসারে করেন?

বিদ্যাসাগর। সকল কার্য করি না, কিন্তু এ কাজটিতে হাত দেবার আগে আমি তাঁহাদের পরামর্শ নিতে চাই।

মার্শাল। এমন কি কাজ? ডাকযোগেই তো আপনি তাঁহাদের মতামত পাইতে পারেন।

বিদ্যাসাগর। আমি এর জন্যই ছুটি চাইছি না। আমার ভায়ের বিয়ে সেইজন্যই ছুটি চাই।

মার্শাল। আমি খুবই দুঃখিত, ছুটি দেওয়া এখন চলিবে না, কাজের বড়ই ক্ষতি হইবে।

[বাহিরে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিল। (বিদ্যাসাগর উঠিলেন)]

বিদ্যাসাগর। ক্লাসের ঘণ্টা পড়িল। উঠি তা হ'লে।

মার্শাল। আচ্ছা, আমি খুবই দুঃখিত, পণ্ডিত।

[বিদ্যাসাগর চলিয়া গেলেন, মার্শাল সাহেব অফিসের কাজকর্ম করিতে লাগিলেন। সহসা বিদ্যাসাগর আবার প্রবেশ করিলেন।]

বিদ্যাসাগর। আমি ভেবে দেখলাম, আমাকে যেতেই হবে।

মার্শাল। ছুটি না দিলেও যাবেন?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ, চাকরি ছেড়ে দিয়ে যাব।

মার্শাল। কি মুশকিল, তাহা হইলে তো ছুটি দিতেই হয়।

[হাসিয়া] কলেজের কাজ অপেক্ষা বিবাহের নিমন্ত্রণটাই আপনার নিকট বড় হইল !

বিদ্যাসাগর। নিমন্ত্রণ বড় নয়, মা ডেকেছেন সেইটেই বড়। যে সন্তান মায়ের আদেশ পালন না করতে পারে, সে নরাধম।

(চলিয়া গেলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দামোদর তীরে একটি খেয়াঘাট, ঘাটের নিকটে একটি কুটির রহিয়াছে। চতুর্দিক অন্ধকার, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, প্রবল বায়ু বহিতেছে ; বায়ুবেগে উত্তাল তরঙ্গ-সমাকুল দামোদরের গর্জন শোনা যাইতেছে। জনপ্রাণী কেহই নাই, দ্রুতপদে বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তাহার পর দাঁড়াইয়া এদিক-ওদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।]

বিদ্যাসাগর। কেউ কোথাও নেই যে দেখছি !

(কুটির দেখিতে পাইয়া সেইদিকে গেলেন।)

মাঝি, মাঝি, এরা সব গেল কোথায় ? মাঝি !

(ঝাঁপ খুলিয়া একটি লোক বাহির হইল)

লোক। মাঝি ফিরতে পারে নি, মেঘ দেখছেন ?

বিদ্যাসাগর। তা তো দেখছি, কিন্তু আমাকে এখুনি পেরুতে হবে যে !

লোক। নৌকা নৈলে যাবেন কিসে চেপে ? ওপার থেকে নৌকাই তো আসে নাই। আর এখন ঝড়ে নৌকাই বা আসে কি করে ? মেঘ দেখেছেন ? দামোদরের ডাক শুনেছেন ?

বিদ্যাসাগর। সব শুনেছি। কিন্তু আমাকে পেরুতেই হবে।

লোক। মাঝি নৌকা নিয়ে ফিরলে তবে তো পার হবেন, সে আজ আর ফিরবে না।

[বিদ্যাসাগর চাদরটি কোমরে বাঁধিলেন এবং ঘাটে নামিয়া গেলেন, লোকটি সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।]

লোক। ওই পাগল বটে নাকি!

(ঝপাৎ করিয়া একটা শব্দ।)
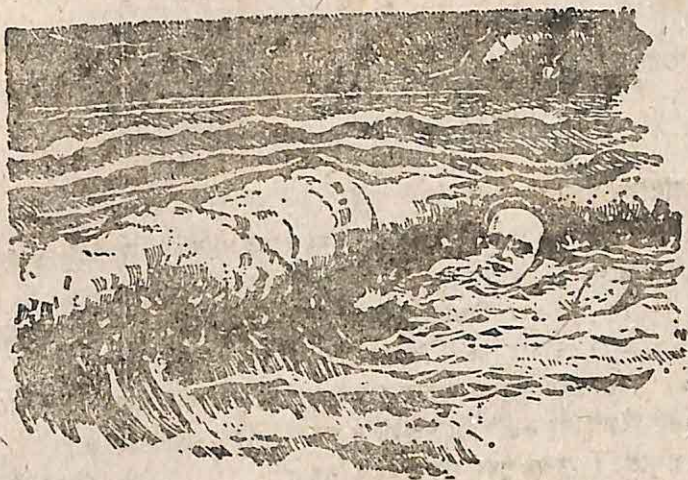
বিদ্যাসাগর সাঁতার দিয়া দামোদর পার হইতেছেন।

তৃতীয় দৃশ্য

[বীরসিংহ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীর অভ্যন্তর। রাত্রি গভীর, চারিদিক নিষুপ্ত, কপাট-জানালা সব বন্ধ। একটি ঘরের বাতায়ন দিয়া ক্ষীণ একটি আলোর রেখা দেখা যাইতেছে।]

বিদ্যাসাগর। (নেপথ্যে) মা, মা!

[যে ঘরের ভিতর দিয়া আলো দেখা যাইতেছিল, সেই ঘরের কপাট সঙ্গে সঙ্গে খুলিয়া গেল, প্রদীপ হস্তে বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী বাহির হইয়া আসিলেন, তিনি যেন জাগিয়াই ছিলেন।]

ভগবতী। ঈশ্বর এলি বাবা?

(আগাইয়া গিয়া বাহিরের কপাট খুলিতে খুলিতে) আমি জেগেই ছিলাম। আয় বাবা, আয়। বড় রাত করলি যে, ওরা সব তোর অপেক্ষায় থেকে থেকে চলে গেল।

[কপাট খুলিয়া দিতেই বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কাপড় ভিজা, স্থানে স্থানে কাদা লাগিয়া রহিয়াছে। ভগবতী দেবী বিস্মিত হইয়া গেলেন।]

একি! (বিদ্যাসাগর প্রণাম করিলেন।)

বিদ্যাসাগর। (হাসিয়া) দামোদরের ঘাট মাঝি ছিল না, সাঁতরেই চলে এলাম।

ভগবতী। পাগল ছেলের কাণ্ড দেখ দেখি। আয় কাপড় ছাড়, মাথাটা মোছ আগে।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন :

১। "যে সন্তান মায়ের আদেশ পালন না করতে পারে সে নরাধম"—একথা কে বলিয়াছিলেন? কি উপলক্ষে তিনি একথা বলিয়াছিলেন?

২। এই নাটিকায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের যে ঘটনাটি জানিতে পারা যায়, তাহা তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

৩। বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন, তাহার প্রমাণ দাও।

৪। বিদ্যাসাগর নাটিকাটিতে কয়টি দৃশ্যের অবতারণা করা হইয়াছে। প্রত্যেক দৃশ্যের বিষয়বস্তু পৃথক পৃথক ভাবে লিখ।

৫। অর্থ লিখ ও বাক্যে প্রয়োগ কর :

ঘনঘটাচ্ছন্ন, নিরীক্ষণ, নিযুক্ত, অভ্যন্তর।

৬। **পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :**

"আমি খুবই দুঃখিত, ছুটি দেওয়া এখন চলিবে না, কারণ কাজের বড়ই ক্ষতি হইবে।" এবাক্যটির প্রত্যেকটির শব্দ কি পদ, লিখ।

৭। মা, তোমার, তাহাকে, আপনার—এই পদগুলি কি পুরুষ, লিখ।

৮। **মৌখিক প্রশ্ন :**

(ক) বিদ্যাসাগর মহাশয় কি বলিয়া মার্শাল সাহেবের কাছে ছুটি চাহিয়াছিলেন? কয় দিনের ছুটি চাহিয়াছিলেন?

(খ) মার্শাল সাহেব প্রথমে কেন ছুটি দিতে চাহেন নাই এবং কেনই বা শেষে ছুটি মঞ্জুর করিলেন?

(গ) বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন দেখিলেন যে পারাপারের জন্য কোনও নৌকা নাই—তখন তিনি কি করিলেন?

A nice example of vidyasagara's personality and devotion to his mother.

অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী

লেখক পরিচিতি : শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি একজন সুলেখক। তাঁহার রচিত কয়েকটি পুস্তক পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহার লেখা "কাব্যে রবীন্দ্রনাথ" বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ।]

আজকাল সন্ধ্যার পর শহরে যে-দিকেই চাও দেখিবে ইলেকট্রিক আলোর ছড়াছড়ি।

কিন্তু একদিন ছিল, যখন এই বিজলিবাতির নামও কেহ জানিত না। তখন ইহার বদলে গ্যাসের আলো জ্বলিত।

এই গ্যাসের আলো যিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম উইলিয়াম মারডক্!

মারডকের পিতার অবস্থা সচ্ছল ছিল না, কাজেই লেখাপড়ায় তিনি বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। স্কটল্যাণ্ডের এক নগণ্য পল্লীতে তাঁহারা বাস করিতেন।

বালক মারডককে সারাদিন পাহাড়ে গরু চরাইয়া বেড়াইতে হইত। ইহার মধ্যে যেটুকু অবসর পাইতেন, ছোট-খাটো কলকব্জা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি হাতে তৈয়ারি করিয়া তিনি তাহার সদ্ব্যবহার করিতেন।

এইভাবে দিন যায়।

হঠাৎ একদিন মারডকের খেয়াল হইল, তিনি শহরে গিয়া কোন কারখানায় ভর্তি হইবেন।

বার্মিংহামে একটা প্রকাণ্ড কারখানা ছিল। এই কারখানার মালিকের সহিত বালক মারডক দেখা করিলেন।

বালক টুপিটি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কারখানার মালিক দু'চারটি প্রশ্ন করিতেই বালকের হাত হইতে টুপিটি খসিয়া পড়িল। কারখানার মালিক লক্ষ্য করিলেন, টুপিটি মাটিতে পড়ায় একটা অদ্ভুত রকমের শব্দ হইল।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—"টুপিতো সোলার হয়, এ কিসের তৈরি বল তো?"

মারডক্ বলিলেন,—"আজ্ঞে, এ টুপি কাঠের তৈরি; এ আমি নিজেই তৈরি করেছি।"

ভদ্রলোক গুণীর আদর করিতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ছেলেটিকে কারখানায় ভর্তি করিয়া লইলেন।

রাত্রে বাসায় ফিরিয়া তিনি যন্ত্রপাতি লইয়া কাজে বসিয়া যান। কিন্তু আলোর অভাবে তাঁহাকে বড় অসুবিধায় পড়িতে হয়। মোমবাতি বা তেলের আলোয় এসব সূক্ষ্ম কাজ করা চলে না। ইহার একটি উপায় না করিলেই নয়। এই প্রথম মারডকের মাথায় নূতন রকম আলো আবিষ্কারের চিন্তা জাগিল।

অতঃপর তিনি তাঁহার যন্ত্রপাতি লইয়া পরীক্ষা শুরু করিলেন। একদিন সহসা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, ছেলেবেলায় এক ব্যক্তি কিসের ধোঁয়া জ্বালাইয়া তাঁহাদের ভেল্কি দেখাইয়াছিল।

মারডকের মন বলিল—কয়লা লইয়াই তাঁহাকে পরীক্ষা শুরু করিতে হইবে। এই নূতন আলোকের সন্ধান কয়লার মধ্যে মিলিবে।

তাহার পর আরম্ভ হইল অদম্য সাধনা। একদিন তিনি একটা বন্ধ কেটলির মধ্যে খানিকটা কয়লা লইয়া তাহাতে উত্তাপ দিতে লাগিলেন। কেটলির নলের মুখে একটা লম্বা রবারের নল লাগাইয়া দেওয়া হইল। এই নলের সাহায্যে কয়লার ধোঁয়া একটা ধাতু-নির্মিত পাত্রে গিয়া সঞ্চিত হইতে লাগিল। এই পাত্রে আর একটি নল লাগানো হইল। এই নলের মুখে ছোট একটা ঠুলি পরানো ছিল। ঠুলিটার গায়ে ছোট্ট একটি ছিদ্র রাখা হইয়াছিল। এই সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ দিয়া পত্রস্থ কয়লার ধোঁয়া বেগে বাহির হইতে লাগিল। মারডক্ সেই ছিদ্রের মুখে আগুন ধরাইলেন। ধোঁয়া অমনি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; সে আলো যেমন তীব্র, তেমনি উজ্জ্বল। তিনি সকলকে তাঁর আবিষ্কারের কথা জানাইলেন। সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন—"এখনি হয়েছে কি? এই আলো দিয়ে সমস্ত শহরটাকে আলোকিত করব।"

এইবার সকলেই হাসিয়া উঠিল। লোকটা পাগল হইল নাকি? ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হামফ্রি-ডেভি ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—"তাঁর চেয়ে বলুন না কেন চাঁদ থেকে কতকটা অংশ কেটে এনে লণ্ডনে ছেড়ে দেব।"

কিন্তু বৈজ্ঞানিকের টিটকারী ও সাধারণের ঠাট্টা-বিদ্রূপ মারডক্‌কে একটুও দমাইতে পারিল না।

ইহার কিছুকাল পরে, একদিন রাত্রে সকল অবাক্ হইয়া দেখিল সত্যই গ্যাসের আলোকে লণ্ডন শহরের পথঘাট আলোকিত হইয়াছে।

Interesting story of a scientific invention.

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন :

১। গ্যাসের আলোক কে আবিষ্কার করেন ? গ্যাসের আলোক যিনি আবিষ্কার, করেন তাঁহার বাড়ী কোথায় ?

২। উইলিয়াম মারডকের বাল্য ও কৈশোর জীবন সম্বন্ধে কি জান ? তিনি কিভাবেবার্মিংহামে এক প্রকাণ্ড কারখানায় চাকুরি সংগ্রহ করেন ?

৩। গ্যাসের আলোক কি ভাবে আবিস্কৃত হয় তাহা সংক্ষেপে বল।

৪। বৈজ্ঞানিক হাম্‌ফ্রি ডেভি কেন উইলিয়াম মারডককে বিদ্রূপ করেন ? তিনি কি বলিয়া বিদ্রূপ করেন ?

৫। অর্থ লিখ ও বাক্যে ব্যবহার কর :
আবিষ্কার, সূক্ষ্ম, উজ্জ্বল, ভেস্কি।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

৬। নিম্নলিখিত পদগুলির বিশেষ্যকে বিশেষণে এবং বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিণত কর :

সন্ধ্যা, চিন্তা, আবিষ্কার, সঞ্চিত, উজ্জ্বল, আলোকিত।

৭। শূন্যস্থান পূরণ কর :

"ইংলেণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক——ঠাট্টা করিয়া বলিলেন"।

"তার চেয়ে বলুন না কেন — থেকে কতকটা অংশে কেটে এনে — ছেড়ে দেব।"

৮। আমাদের দেশে দু-একজন বিজ্ঞানীর নাম বল। তাঁহারা কি আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন ?

[বেদ হইতে অনুবাদ]

—স্বামী বিশ্রাশ্রয়ানন্দ

[স্বাস্থ্য, সাহস, বল, জ্ঞান, সৎচিন্তা—এইগুলি মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ছোট ছোট শিশুরা ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে।]

অসৎ হইতে মোরে
সৎপথে নাও,
জ্ঞানের আলোক জ্বেলে
আঁধার ঘুচাও।
মরণের ভয় যাক,
অমর কর,
দেখা দিয়ে ভগবান
শঙ্কা হর।
করুণা-আশিষ ঢালো
রুদ্র শিরে,
চিরদিন থাকো মোর
জীবন ঘিরে।

ঝরিয়া পড়ুক শান্তি
চরাচরময়
চিরশান্তি-পরিমলে
ভরুক হৃদয়।

An eternal prayer for the highest.

অনুশীলনী

১। ছোট ছোট শিশুরা ভগবানের কাছে কি প্রার্থনা করিতেছে ?

২। ব্যাখ্যা কর :—

ঝরিয়া পড়ুক শান্তি……ভরুক হৃদয়।

করুণা আশিষ ঢালো……জীবন ঘিরে।

৩। অর্থ লিখ :—

শঙ্কা, করুণা, আশিষ, রুদ্র, চরাচরময়, পরিমল।

৪। কবিতাটি মুখস্থ লিখ :

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

৫। পদ পরিবর্তন কর :—

জ্ঞান, অমর, শঙ্কা, শান্তি।

৬। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :

অসৎ, জ্ঞান, শান্তি।

প্রার্থনা

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[**কবি পরিচিতি ঃ** কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবংশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বিদ্যালয়ের মামুলী লেখাপড়া না শিখিলেও বাড়ীতে অনেক কিছু শিখিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে কবিতা লিখিতেন। তিনি 'গীতাঞ্জলী' লিখিয়া নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।]

বাংলার মাটি
বাংলার জল
বাংলার বায়ু
বাংলার ফল
পুণ্য হউক
পুণ্য হউক
পুণ্য হউক
হে ভগবান!

বাংলার ঘর,
বাংলার হাট,
বাংলার বন,
বাংলার মাঠ,
পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক,
হে ভগবান!

বাঙালীর পণ,
বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ,
বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক
সত্য হউক,
সত্য হউক
হে ভগবান্!

বাঙালীর প্রাণ,
বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে
যত ভাইবোন,
এক হউক,
এক হউক,
এক হউক
হে ভগবান্।

অনুশীলনী

১। 'প্রার্থনা' কবিতায় বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির জন্য কবি যাহা 'প্রার্থনা' করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে লিখ।
২। কবিতার শেষ দুইটি স্তবক মুখস্থ লিখ।
৩। প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শেষ স্তবকটির ব্যাখ্যা লিখ।
৪। পার্থক্য দেখাও ঃ পুণ্য; পূর্ণ।

A prayer for the welfare of Bengal and Bengalees

বঙ্গভাষা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[**কবি-পরিচিতি ঃ** মধুসূদন দত্ত যশোহর জেলায় সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করেন। প্রথমে তিনি রেবেকা নাম্নী একটি খ্রীষ্টান রমণীকে বিবাহ করেন। পরে তিনি রেবেকাকে ত্যাগ করিয়া হেনরিয়েটা নামক আর এক রমণীকে বিবাহ করেন। তিনি বাংলা ভাষায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন। তিনি মেঘনাদবধ-কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, শর্মিষ্ঠা নাটক লিখিয়া যশস্বী হন। ব্যারিস্টারী পড়িবার জন্য তিনি বিলাত যান, কিন্তু ব্যারিস্টারী ব্যবসায়ে তিনি বিফলকাম হন। অত্যন্ত অর্থ কষ্টে তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত হয় এবং হাসপাতালে অতি দীন অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়।]

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,—
তা' সবে (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,'
পর-ধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পর-দেশে, ভিক্ষা-বৃত্তি কুক্ষণে আচরি'।
কাটাইনু বহুদিন সুখে পরিহরি'
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি' কায়, মন,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি' ;—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি' কমল-কানন।
স্বপ্নে তব কুল-লক্ষ্মী ক'য়ে দিলা মোরে,—
"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি ;

এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি,' অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি' ঘরে।"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।

Eulogy to Bengali language.

অনুশীলনী

১। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম জীবনে কোন্ ভাষা চর্চা করিয়াছিলেন ? তিনি কি ভুল করিয়াছিলেন ? তিনি কি ভাবে বাংলা ভাষা চর্চায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন ?

২। 'বঙ্গভাষা' কবিতার সারমর্ম নিজের ভাষায় লিখ।

৩। ব্যাখ্যা কর :

(ক) মজিনু বিফল তপে.........কমল-কানন।

(খ) পালিলাম আজ্ঞা সুখে......পূর্ণ-মণিজালে।

৪। শব্দার্থ লিখ :

কমল-কানন, মত্ত, অবরেণ্য, শৈবাল, পরিহরি।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :

৫। পদ নির্ণয় কর :

মত্ত, কায়, বিফল, বরি, কেলিনু, অজ্ঞান, কেন।

৬। সমশব্দ লিখ :—পদ্ম।

মৌখিক প্রশ্ন :

৭। (ক) কাহাকে কবি অবরেণ্য বলিতেছেন ?

(খ) শৈবাল বলিতে এবং কমল কানন বলিতে কবি কি বুঝাইতেছেন ?

(গ) কবি পরধন বলিতে কি বুঝাইতে চাহিতেছেন ?

বাঙ্‌লা মা

—কাজী নজরুল ইসলাম

[কবি-পরিচিতি : কাজি নজরুল ইসলাম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি সৈনিকের চাকুরি গ্রহণ করেন। পরে তিনি সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ধূমকেতু পত্রিকায় রাজদ্রোহজনক রচনা প্রকাশ করার জন্য তিনি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। ব্যথার দান, বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা, অগ্নিবীণা তাঁহার অপূর্ব সৃষ্টি। সম্প্রতি তিনি মস্তিষ্ক রোগে কষ্ট পাইতেছেন।]

আমার শ্যাম্‌লা-বরণ বাঙ্‌লা মায়ের
রূপ দেখে যা, আয়রে আয়।
গিরি দরী বনে মাঠে প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়॥
ধানের ক্ষেতে বনের ফাঁকে
দেখে যা মোর কালো মাকে,
ধূলি-রাঙা পথের বাঁকে
বৈরাগিণী বিন্ বাজায়॥

ভীরু মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় পল্লীগ্রামে একলাটি,
বিজন মাঠে গ্রামে সে বসায় নিয়ে কাদা খড় মাটি।
কাজল মেঘের ঝারি নিয়ে করুণায় সে বারি ছিটায়॥
কাজ্‌লা-দীঘির পদ্মফুলে যায় দেখা তার পদ্ম মুখ,
খেলে বেড়ায় ডাকাত-মেয়ে বনে ল'য়ে বাঘ ভালুক ;
ঝড়ের সাথে নৃত্যে মাতে, বে'দের সাথে সাপ নাচায়॥

নদীর স্রোতে পাথর-নুড়ির কাঁকণ চুড়ি বাজ্‌ছে যে তার,
দাঁড়ায় সাঁঝের অলিন্দে সে টিপ্‌টি প'রে সন্ধ্যাতারার ;
উষার গাঙে ঘট ভরিতে যায় সে মেয়ে ভোর-বেলায় ॥
হরিৎ শস্যে লুটায় আঁচল, ঝিল্লীতে তার নূপুর বাজে ;
ভাটির স্রোতে গায় ভাটিয়াল, গায় সে বাউল মাঠের মাঝে,
গঙ্গা-তীরে শ্মশান-ঘাটে কেঁদে কভু বুক ভাসায় ॥

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন :

১। "বাংলা মা" কবিতায় প্রথম স্তবক এবং শেষ স্তবকটি অবিকল মুখস্থ ছিল।

২। বাংলা মায়ের রূপটি বর্ণনা কর।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা লেখ—

(ক) দাঁড়ায় সাঁঝের অলিন্দে……
……ভোর-বেলায়।

(খ) গঙ্গা-তীরে শ্মশান-ঘাটে কেঁদে কভু বুক ভাসায়।

৪। **গদ্যরূপ লেখ :**
বীন্ ; সাথে ; সাঁঝের।

৫। **শব্দার্থ লিখ এবং বাক্যে তাহাদের ব্যবহার দেখাও :**
প্রান্তরে, বৈরাগিণী, বিজন, অলিন্দ, ঝিল্লী, শ্মশান, বেদে, গিরি, বারি।

৬। **পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :**
সমনাম শব্দ লিখ : গিরি, মেঘ, করুণা, বারি, অলিন্দ।

৭। **মৌখিক প্রশ্ন :**

(ক) কোথায় বাংলা মায়ের পদ্মমুখ দেখা যাইবে ?

(খ) কে ঝড়ের সাথে নৃত্যে মাতে ?

(গ) কে কোথায় ও কেন কাঁদিয়া বুক ভাসায় ?

(ঘ) কাজল মেঘের ঝারি নিয়ে সে কি ছিটায় ?

Characteristics of Bengal

পাছে লোকে কিছু বলে

—কামিনী রায়

[**কবি পরিচিতি :** কামিনী রায় ১৮৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আদি নিবাস ছিল বরিশাল জেলার বাসন্দা গ্রামে। তিনি স্বনামধন্য গ্রন্থকার চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা। আট বৎসর বয়স হইতেই তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি ছোট কবিতা লিখিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার রচিত কাব্য গ্রন্থগুলির মধ্যে আলো ও ছায়া, দীপ ও ধূপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বি. এ. পাশ করিবার পর তিনি বেথুন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।]

করিতে পারি না কাজ
সদা ভয়, সদা লাজ
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে,
পাছে লোকে কিছু বলে!
আড়ালে আড়ালে থাকি
নীরবে আপনা ঢাকি,
সম্মুখে চরণ নাহি চলে,
পাছে লোকে কিছু বলে!

হৃদয়ে বুদ্‌বুদ্ মত
উঠে শুভ্র চিন্তা কত,
মিশে যায় হৃদয়ের তলে,
পাছে লোকে কিছু বলে!
কাঁদে প্রাণ যবে, আঁখি
সযতনে শুষ্ক রাখি,
নিরমল নয়নের জলে,
পাছে লোকে কিছু বলে!
মহৎ উদ্দেশ্য যবে
একসাথে মিলে সবে,
পারি না মিলিতে সেই দলে,
পাছে লোকে কিছু বলে!
বিধাতা দেছেন প্রাণ,
থাকি সদা ম্রিয়মাণ,
শক্তি মরে ভীতির কবলে,
পাছে লোকে কিছু বলে!

॥ অনুশীলনী ॥

১। 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতাটির সারাংশ নিজের ভাষায় লিখ।
২। কবি নিজেকে কেন আড়ালে রাখিতে চাহেন?
৩। পদ পরিবর্তন কর:
স্নেহ, মহৎ, উপেক্ষা।

A common idea of human weakness

বাংলা ভাষা

—অতুলপ্রসাদ সেন

[**কবি-পরিচিতি :** কবি অতুল প্রসাদ সেন ১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৪১ খ্রীষ্টাব্দে তঁহার মৃত্যু হয়। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি ব্যারিস্টার ছিলেন এবং লক্ষ্ণৌ শহরে তাঁহার কর্মজীবন অতিবাহিত হয়। তিনি উত্তরা নামক একখানি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি একনিষ্ঠ দেশসেবক ছিলেন। তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ গীতিকুঞ্জ ও কাকলি।]

আ মরি বাংলা ভাষা!
মোদের গরব, মোদের আশা!
তোমার কোলে তোমার বোলে কতই শান্তি ভালবাসা॥
কি যাদু বাংলা গানে,
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা॥
ওই ভাষাতেই নিতাই গোরা
আনল দেশে ভক্তিধারা;
আছে কই এমন ভাষা, এমন দুঃখ-ক্লান্তি-নাশা॥
বিদ্যাপতি-চণ্ডী-গোবিন্
হেম-মধু-বঙ্কিম-নবীন,
ওই ভাষারই মধুর রসে বাঁধল সুখে মধুর বাসা॥
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে,
আনল মালা জগৎ জিনে;
তোমার চরণতীর্থে মাগো জগৎ করে যাওয়া-আসা॥
ওই ভাষাতেই প্রথম বোলে
ডাকলাম মায়ে 'মা মা', বলে
ঐ ভাষাতেই বলবো 'হরি' সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা॥

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন :

১। বংলাভাষা কবিতার প্রথম আট পংক্তি এবং শেষ আট পংক্তি অবিকল উদ্ধৃত কর।

২। কি কারণে কবি বাংলা ভাষাকে 'মোদের গরব' এবং 'মোদের আশা' বলিয়াছেন ?

৩। "বাজিয়ে রবি তোমার বীণে, আনল মালা জগৎ জিনে ;
তোমার চরণতীর্থে মাগো জগৎ করে যাওয়া আসা ॥

রবি কে ? মালা কি ? তিনি কি ভাবে মালা জয় করিয়াছিলেন ? তোমার চরণ তীর্থে মাগো জগৎ করে যাওয়া-আসা—উক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন কর।

৪। "বংলা ভাষা" কবিতায় কবি অতুল প্রসাদ সেন কি ভাবে বাংলা ভাষায় প্রশস্তি করিয়াছেন ?

৫। গৌর নিতাই কিভাবে দেশে ভক্তি ধারা আনিয়াছিলেন ?

৬। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) ওই ভাষাতেই নিতাই গোরা, আনল দেশে ভক্তিধারা ;
আছে কই এমন ভাষা এমন দুঃখ ক্লান্তিনাশা ॥

(খ) বাজিয়ে রবি তোমার বীণে, আনল মালা জগৎ জিনে
তোমার চরণ-তীর্থে মাগো জগৎ করে যাওয়া-আসা ॥

(গ) ওই ভাষাতেই প্রথম বোলে ডাকলাম মায়ে 'মা মা' বলে
ঐ ভাষাতেই বলবো "হরি" সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা ॥

৭। টীকা লিখ :—হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন, বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন।

৮। অতিরিক্ত প্রশ্ন :—বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়া যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, তাঁদাদের নামের তালিকা তৈয়ার করি।

৯। **পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ :**

পদ বিচার করিয়া ঠিক উত্তরটির নীচে দাগ দাও।

পদ	পদ বিচার
মালা	বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া
আনল	অব্যয়, ক্রিয়া, বিশেষ্য
প্রথম	ক্রিয়া, বিশেষ্য, বিশেষণ।

১০। **মৌখিক প্রশ্ন :**

(ক) বাউল কাহাকে বলে ? (খ) মধুর বাসা কথাটির অর্থ কি ?

(১১) রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কি জান তাহা সংক্ষেপে বল।

আমার বাড়ী

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

[**কবি-পরিচিতি :** আধুনিক শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবিদের নাম করিতে হইলে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের নাম করিতে হয়। তিনি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রাম তাঁহার আদি বাসস্থান। তিনি সারাজীবন শিক্ষকতা করেন। তাঁহার রচিত উজানী, একতারা, শতদল, রজনীগন্ধা—বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।]

বাড়ী আমার ভাঙ্গন-ধরা অজয় নদীর বাঁকে,
জল সেখানে সোহাগ-ভরে স্থলকে ঘিরে রাখে।
সামনে ধূসর বেলা জলচরের মেলা,
সুদূর গ্রামের ঘর দেখা যায় তরুলতার ফাঁকে॥
ঠিক দুপুরে বাতাস লেগে নাচে জলের ঢেউ,
আমি দেখি আপন মনে, আর দেখে না কেউ।
জেলেরা দেয় বাঁচ লাফায় বোয়াল মাছ,
নীরব আকাশ মুখর করে শঙ্খচিলের ডাকে॥
ভাঙ্গা বাড়ীর ভাঙ্গা ঘাটে আছড়ে পড়ে জল,
মেঠো ফুলের মিঠে বাসে মন করে চঞ্চল॥
যত দূরে চাই শোভার সীমা নাই,

পল্লীবধূ কলসী করে জল লয়ে যায় কাঁখে ॥
মাধবী আর মালতীতে ঘেরা উঠান মোর,
আমের গাছে কোকিল ডাকে সারাটি দিনভোর।
দোয়েল পাপিয়ায় গানে কানন ছায়
চক্র রচে মৌমাছিরা নিত্য ঝাঁকে ঝাঁকে ॥

অনুশীলনী

১। অজয়তীরে প্রকৃতির বর্ণনা দাও।

২। কবি বলিয়াছেন—"আমি দেখি আপন মনে আর দেখে না কেউ" —এই কথাটির সার্থকতা কি ?

৩। বানান বল, মানে শিখ ও বাক্যরচনা কর :—
স্থল, ভাঙ্গন, বাঁচ, শঙ্খচিল, চক্র।

Emotional attachment to one's own residence in natural surroundings.

আষাঢ়

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহি রে ॥
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরো-ঝরো,
আউশের ক্ষেত জলে ভরো-ভরো'
কালি-মাখা মেঘে ও-পারে আঁধার
ঘনিয়েছে, দেখ্‌ চাহি' রে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে ॥
ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘন ঘন,
ধবলীরে আনো গোহালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্‌ দেখি,
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরেছে কি,

রাখাল বালক কী জানি কোথায়
সারাদিন আজ খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে॥
শোনো শোনো ওই পারে যাবে ব'লে
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে॥
পূবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দুকূল বহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদর বেগে জলে পড়ি জল
ছল ছল উঠে বাজি রে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে॥
ওগো, আজ তোরা যাস্‌নে গো তোরা
যাস্‌নে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর
নাহি রে॥
ঝর-ঝর ধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ঐ বেনুবন দুলে ঘনঘন
পথ পাশে দেখ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে।

A common scene of rainy season in Bengal.

অনুশীলনী

১। এই কবিতার প্রথম এবং শেষ স্তবকটি মুখস্থ লিখ।

২। আষাঢ় কবিতায় বর্ষাস্নাত পল্লী-প্রকৃতির বর্ণনা দাও।

৩। "ওগো, আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের বাহিরে"

তোরা বলিতে কাহাদের বলা হইয়াছে? কবি কেন ঘরের বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন?

৪। ব্যাখ্যা লেখ:

(ক) ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘন ঘন
ধবলীরে আনো গোহালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্‌ দেখি,
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরেছে কি,
রাখাল বালক কী জানি কোথায় সারাদিন আজ খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে।

(খ) শেষ স্তবকটির ব্যাখ্যা লিখ।

৫। অর্থ লিখ এবং বাক্যে প্রয়োগ কর:
গগন, ধেনু, ধবলীরে, খোয়ালে, নিচোল, বেণুবন।

৬। **পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ:**

(ক) পার্থক্য দেখাও—কুল, কূল

মৌখিক প্রশ্ন:

(ক) ধেনু ঘন ঘন ডাকিতেছে কেন?

(খ) বর্ষার সময়ে, হাওয়া কোন্‌ দিকে প্রবাহিত হয়?

(গ) বর্ষার সময় কবি সকলকে ঘরের বাহিরে যাইতে নিষেধ করিতেছেন কেন?

(ঘ) পদ নির্ণয় কর:
নীল, ভরো ভরো, গোহালে, দুলে, নিচোল।

মালঞ্চ

—কবিশেখর কালিদাস রায়

[**লেখক-পরিচিতি :** কালিদাস রায় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজন্ম মনেপ্রাণে শিক্ষক। তিনি সর্বদাই অন্তরের ভাবধারাকে সুন্দর ভাষায় এবং সুললিত ছন্দে রূপ দিয়াছেন। তাঁহার রচিত প্রধান প্রধান কাব্য গ্রন্থগুলি হইতেছে পর্ণপুট, ব্রজবেণু, রসকদম্ব, হৈমন্তী ও বৈকালী। তিনি এখনও বাঁচিয়া আছেন।]

আমরা কয়টি ভাইবোনে মিলে লাগিয়েছি গাছপালা,
নিজে হাতে ক'রে বেঁধেছি বেড়াটি গড়েছি মাচান চালা।
আমি সেঁচি জল, দিদি তোলে ঘাস গাছেদের গোড়া হ'তে,
কোদাল কোপায়ে দাদাটি আমার মাটি খোঁড়ে, চারা পোঁতে।
লতাটি জড়াই, পাতাটি কুড়াই, ফুল নিয়ে খেলা করি,
সবুজ ঠাণ্ডা মাচানের তলে দুপুরে ঘুমিয়ে পড়ি।
কুঁড়িটি উঠিলে, ফুলটি ফুটিলে, প্রথম ধরিলে ফল,
খাওয়া নাওয়া সব ভুলে যাই মোরা হাসি গাই অবিরল।
পাতাটি ঝরিলে, লতাটি পড়িলে, বুকে বড় ব্যথা পাই,
প্রজাপতি সাথে ঝোপ ঝাড়ে রই দুই বোন দুটি ভাই।
লক্‌লক্ করে কিবা কচি কচি পুঁই-এর ডগালীগুলি,
শত শত সাপ দুলিতেছে যেন অবিরত ফণা তুলি'।
ঝিঙে ফুলে ফুলে ঢাকিয়াছে পাতা, হলুদের ছড়াছড়ি,
মাচান ছাপায়ে লাউপাতাগুলি ভুঁয়ে যায় গড়াগড়ি।
বড় বড় কাঁদি কলা ভেঙে মাটিপানে পড়ে ঝুঁকি,
কোলে চড়িয়াই হাতটি বাড়ায়ে ছুঁতে পারে ছোট খুকী।
শাকের চাপড়া যেন বা বিছানা ময়ূরকণ্ঠী শাড়ী,
বেগুনিয়া-ফুলে ভরা শিমলতা আঁচলা বিছায় তারি।

তক্ তক্ করা বাগানের পথ, দুই পাশে তার দুলে,
পালঙের শীষ, রোশনাই জ্বলে মটরের ফুলে ফুলে।
মাথার উপরে অতসীর গাছ, বাজাতেছে ঝুনঝুনি,
হলুদ রঙের ফুলে আলো করে বিকালে সন্ধ্যামুনি।
পট পট ক'রে চায় যেন তারা কহিবারে চায় কথা,
মনে হয় যেন বলিতে পারে না বুকে কি তাদের ব্যথা।
গলা উঁচু করি কি যেন বলিছে রজনীগন্ধাগুলি,
কতই আদরে আহ্লাদে তারা পায়ে পড়ে ঢুলি ঢুলি।
পুঁইমেটুরির আলতা পরিয়া চুলে গুঁজি জবা ফুল,
কানে দেয় দাদা পরায়ে আমার ঝুমকো ফুলের দুল।
শিউলী বোঁটায় কাপড় রঙাই গলে পরি বেলি মালা
হাতে পরি মোরা নীল ফুলে ভরা অপরাজিতার বালা।
দোপাটি ফুলের আরতি করিয়া প্রজাপতি ঘুরে ঘিরে,
পাখীগুলি কেউ করে নাক ভয় কাছে বসে ধীরে ধীরে।
ফড়িঙের সাথে ভোমরার সাথে ঝিঁঝিদের দলে থাকি,
মটর ছড়ায়ে পায়রাগুলোয় ছাদ হতে আনি ডাকি।
চীনে করবীর ডালে ঝুল খেয়ে কেটে যায় সারা বেলা,
ভাই বোনে মিলি শুধু গাছ-গাছ, ফুল-ফুল করি খেলা।

অনুশীলনী

১। 'মালঞ্চ' কবিতাটির সারাংশ নিজের ভাষায় লিখ।
২। 'মালঞ্চ' কবিতাটির বর্ণিত বাগানটির বর্ণনা দাও।
৩। গদ্যে কিরূপ হইবে, তাহা লিখ:
সেঁচি, ভুঁয়ে, আঁচলা।

A Scene of sweet relationship between the man and the natural objects.